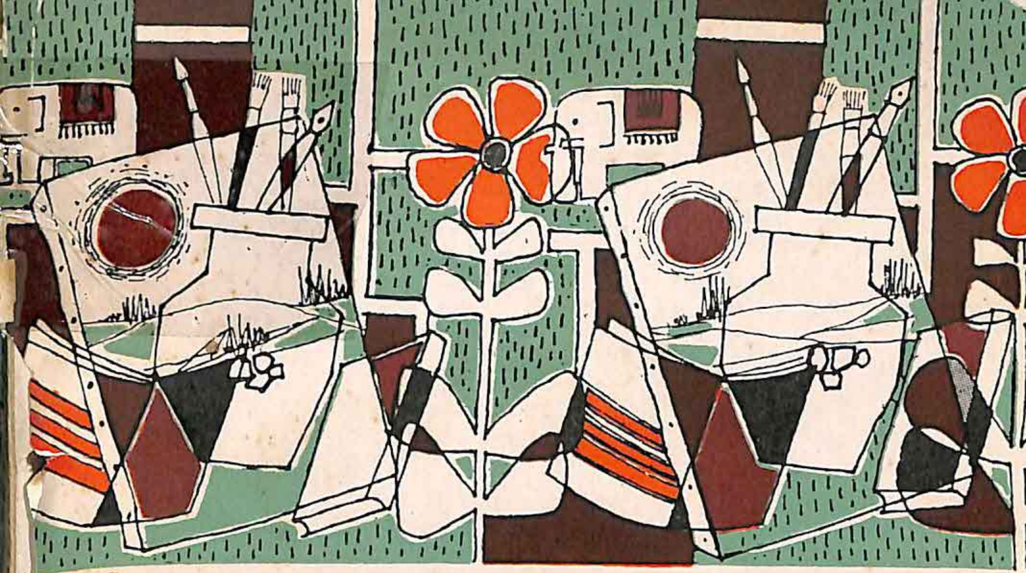
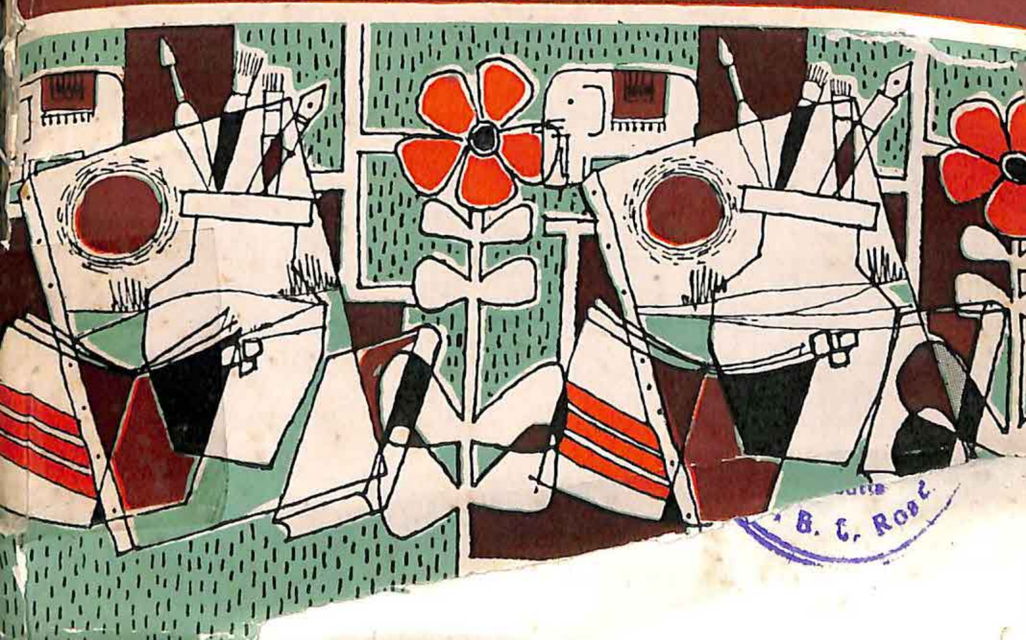


সাহিত্য পাঠ



পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক ১৯৭৭ শিক্ষাবর্ষ হইতে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার
মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, জুনিয়ার ও মাদ্রাসা বিদ্যালয় সমূহের অষ্টম
শ্রেণীর ছাত্র- ছাত্রীদের পাঠ্য পুস্তকরূপে অনুমোদিত।
Vide Notification No. T. B. 76|8|TB|85 dated 13.1.77.

সাহিত্য পাঠ

[পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য]

অধ্যাপক সুশীল জানা

বঙ্কিম পুরস্কারে সম্মানিত, আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, পূর্বানুমোদিত ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর
অতিরিক্ত পাঠ্য 'সেকালের গল্প' ও প্রসিদ্ধ 'গল্পময়
ভারত' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা কর্তৃক সংকলিত ও
সম্পাদিত।

বি: বি: কুণ্ডু এণ্ড সন্স
ভুজঙ্গ ভুষণ কুন্ডু এণ্ড সন্স
৬২/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক :
বিভূতিভূষণ কুন্ডু
৬২/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯
ফোন নং ৩১-১৪০৭

প্রথম সংস্করণ—১৯৭৬
দ্বিতীয় সংস্করণ (পর্ষদ কর্তৃক সংশোধিত)—১৯৭৭
তৃতীয় সংস্করণ (পরিমার্জিত)—১৯৮৬
চতুর্থ সংস্করণ—১৯৮৭

মূল্য : আট টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীচন্দনকুমার বক্সী
প্রিন্টিং সিন্ডিকেট
৮, মদন ঘোষ লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচীপত্র

গদ্যাংশ

পদ্যাংশ

গদ্যাংশ



বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস

দীনেশচন্দ্র সেন

"কৃত্তিবাস নাম তোমা! কীর্তির বসতি
সতত তোমার নামে সুবঙ্গ ভবনে......"
—মধুসূদন।

কৃত্তিবাসের রামায়ণকে বাল্মীকি-রামায়ণের ঠিক অনুবাদ বলা যায় না। ফটোগ্রাফ যেমন প্রকৃতির চিত্রালেখ্য, স্বল্পায়তনে অথচ যথার্থরূপে প্রতিবিম্বিত হয়, কৃত্তিবাসী মুকুরে বাল্মীকির রামায়ণ সেইরূপ প্রতিবিম্বিত হয় নাই; মূল পাঠ করিলে দেখা যায়, শ্রীরামচন্দ্র দেবতা নহেন,—দেবোপম; মানুষী শক্তি ও বীর্যবত্তার আতিশয্যে তাঁহাকে ক্ষণে ক্ষণে দেব বলিয়া ভ্রম হয় এই মাত্র। কৃত্তিবাসী রামায়ণের রাম ভক্তের আরাধ্য অবতার, তুলসী চন্দনে লিপ্ত

বিগ্রহ। তিনি কোমল করপল্লবের ইঙ্গিতে সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার করিতে পারেন ; তিনি বংশীধারীর ভ্রাতা, প্রেমাশ্রুপূর্ণ চক্ষু ; ভক্তের চক্ষে জল দেখিলে যোজিত শরটি তূণীরে রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলেন। মূলে আছে, কৌশল্যা বনগত পুত্রকে স্মরণ করিয়া সুমন্ত্রের নিকট বলিতেছেন—"রাম পুষ্পবৎ কোমল উপাধানে শিররক্ষা করিয়া নিদ্রা সুখ উপভোগ করিত, এখন স্বীয় বজ্রবৎ কঠিন ভুজে শির রক্ষা করিলে কিরূপে শয়ন করিবে ?"

রামের চিত্র পাছে কঠোর হয় এই ভয়ে কৃত্তিবাস বজ্রবৎ কঠিন ভুজের কথা উল্লেখ করেন নাই। প্রকৃতই যদি রামের ভুজ কোমল কিশলয়োপম হইত, ও চাঁপা নাগেশ্বর দিয়া রামের চূড়া বাঁধা থাকিত, তবে কি রাবণবধ হইত, না এখনকার ঐতিহাসিকগণের মতানুসারে আর্য-ভুজবলে দাক্ষিণাত্য বিজয় হইত! শৌর্যই পুরুষের সৌন্দর্য, কমনীয়তা নহে। মূল রামায়ণে রামের ভয়াবহ মূর্তি দেখিয়া মারীচ রাক্ষস বলিয়াছিল—

"বৃক্ষে বৃক্ষে আমি করাল রামমূর্তি দর্শন করি, ধনুষ্পাণি রামমূর্তি ছায়ার ন্যায় কাননের সর্বত্র দর্শন করিয়া নির্জনে চমকিত হই।"

সীতা হরণের পর যখন গদ্‌গদ্‌নাদী গোদাবরী তীরে কদম্ব, অশোক কর্ণিকার বৃক্ষকে বিরহী শ্রীরামচন্দ্র বার্তা জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইলেন না, পথে রক্ত বিন্দু ও রাক্ষসের পদাঙ্ক দর্শন করিয়া রাক্ষস কর্তৃক সীতাবদ্ধ আশঙ্কা করিলেন, তখন বিরাট ধনুতে জ্যা আরোপণ করিয়া জরা ব্যাধি কি মৃত্যুর ন্যায় করাল-বেশে প্রকৃতিকে সংহার করিতে সমুদ্যত হইলেন, শ্রীরামচন্দ্রের সেই চিত্র অতি ভীষণ, সেই অসম্বদ্ধ প্রলাপোক্তিতে রামের মনোহর চিত্রে ভীষণতাশ্রিত অপূর্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহার ক্রোধে ভাবী রাক্ষস সংহারের ছায়া পড়িয়াছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই সকল ছবির যথাযথ প্রতিকৃতি উঠে নাই। যে আনন্দ প্রকৃতির মাধুরী মূলে প্রতিবিম্বিত—পদ্মসম্পীড়িত পম্পাবারি ; শ্লথচরণ্য রমণীর ন্যায় বর্ষাক্ষয়ে নদীর ধীর মন্থরগতি, শৃঙ্গধারী ককুদ্‌মানের ন্যায় বালেন্দুশীর্ষ মেঘমন্ডল এবং বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী কৃত্তিবাসী অনুবাদে প্রতিবিম্বিত হয় নাই। কিন্তু রাম ও লক্ষ্মণের সৌহার্দ্য, কৌশল্যার শোক, সীতার ক্ষাত্রেয় তেজ, ব্রহ্মচর্য নহে—গৃহস্থবধূর ন্যায় ব্রীড়াবনত মাধুরী—বোধ হয় মূলাপেক্ষা অনুবাদে আরও সুন্দর হইয়াছে। আরও একটি অভিনব বস্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে পাই—তাহা রামচন্দ্রের বৈষ্ণবীয় কোমলতা—ভক্তের জন্য করুণা।

বাঙালীর নিজ ভাব দ্বারা ঈষৎ পরিবর্তিত ও নবরূপে প্রতিষ্ঠিত

হওয়ায় কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' বঙ্গীয় গৃহস্থের এত আদরের বস্তু হইয়াছে। মিতব্যয়ী বণিক ক্ষুদ্র দীপাধারাটি অকাতরে তৈল-পূর্ণ করিয়া যে গীতি অর্ধরাত্র জাগিয়াও পাঠ করে, তাহা এখনও আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিয়া কোমল করে ; সেই গীতি আমাদের শৈশবের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। তাহার অপরিস্ফুট মাধুর্য শুধু শৈশবের কথা নহে, কত যুগযুগান্তরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে কৃত্তিবাসের জন্মকাল। কৃত্তিবাসের রামায়ণের একখানি প্রাচীন পুঁথির ভণিতায় লিখিত আছে, তিনি 'অরণ্যকাণ্ড' লেখার সময়ই রোগজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং তিনি দীর্ঘায়ু হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। মনে হয় তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন।

কৃত্তিবাস যে রাজসভার বর্ণনা দিয়াছেন তাহা হিন্দুরাজার। এই রাজার যে বর্ণনা আছে, তাহাতে স্পষ্টই মনে হয় তিনি গৌড়ের প্রবল-প্রতাপান্বিত সম্রাট রাজা গণেশ ভিন্ন আর কেহ নহেন। রাজার সচিবগণ কবিকে জানাইয়াছিলেন, একমাত্র গৌড়েশ্বর যাঁহাকে আদর করিবেন, তাঁহারই গুণগাথা সমস্ত প্রদেশে প্রতিষ্ঠা পাইবে।

কৃত্তিবাস যেদিন রাজার দ্বারা অভিনন্দিত হইলেন সেদিন নগরীতে ধন্য ধন্য শব্দ উত্থিত হইয়াছিল, সেই ধন্যবাদের প্রতিধ্বনি এখনও লুপ্ত হয় নাই। বঙ্গ সাহিত্যে সে এক শুভ মুহূর্ত। কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের দান প্রতিগ্রহ করিতে সম্মত হন নাই। পার্থিব অর্থ নগণ্য, 'আমার-রচনা অনিন্দ্য এই শুধু শুনিতে চাই'। সে কথা গৌড়েশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া এই পাঁচশত বৎসর পর্যন্ত বঙ্গীয় প্রতি গৃহে গৃহে স্বীকৃত হইয়াছে। যে গৌড়েশ্বরের পঞ্চগৌড়-ব্যাপী অধিকারের কথা উল্লেখ করিয়া কবি রাজকীয় অনুগ্রহে আপনাকে সম্মানিত মনে করিয়াছিলেন, কৃত্তিবাস তাঁহার সভায় পদধূলি দিয়াছিলেন বলিয়া আজ আমরা এত আগ্রহের সহিত সেই রাজা কে ছিলেন, তাহা জানিতে চাহিতেছি। এবং তিনি যখন কবিকে দান দিতে চাহিলেন, কবি সগর্বে তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন, সেই সময়ে পঞ্চ-গৌড়েশ্বরের মুকুটের সর্বশ্রেষ্ঠ হীরকটি হইতে কবির মস্তকশোভী বাণীপ্রদত্ত নির্মাল্য আমাদের চক্ষে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছিল। ধন্য অমাত্য কেদার খাঁ—যিনি কবির শিরে চন্দনের ছড়া ঢালিয়া বাণীর বরপুত্রকে অভিনন্দিত করিয়া হস্ত পবিত্র করিয়াছিলেন

এবং গৌড়েশ্বর ধন্য, যিনি কবিকে রামায়ণ অনুবাদের ভার দিয়া বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ হিতসাধন করিয়াছিলেন।

অনুশীলনী

পাঠ-সংকেত : এই রচনায় 'রামায়ণ'কে কেন্দ্র করিয়া আদি মহাকবি বাল্মীকি এবং বাংলার আদি-মধ্যযুগের কবিপ্রধান কৃত্তিবাস ওঝার কবি-প্রতিভার একটি সুন্দর আলোচনা দেওয়া হইয়াছে। কাল ও প্রদেশ ভেদে দুই কবির দুই ধারা। মূল রামায়ণের অনুসরণ করিলেও কৃত্তিবাস আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ সাধারণ সপ্তকোটি বাঙালীকে তিনি শুধু বাঙলা ভাষায় মূল রামকথা শোনাইবার জন্যই ধন্যবাদার্হ নহেন, পরন্তু মমতাময়, প্রেমময়, সৌহার্দ্যময় বাঙালীর ঘর-সংসারের একটি উজ্জ্বল চিত্রকাব্য রচনা করিয়া অমর হইয়া আছেন।

[ক] মৌখিক প্রশ্ন :

১। এই রচনাটির রচয়িতা কে ?
২। কৃত্তিবাস কি বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদকমাত্র ?
৩। গৌড়েশ্বর কাহাকে বলা হইয়াছে ?
৪। 'সেই গীতি আমাদের শৈশবের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত।'— কোন্ গীতি ?

[খ] সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। বাল্মীকি রামায়ণে রামচন্দ্র কি দেবতারূপে চিত্রিত ?
২। কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামচিত্র কিরূপ ?
৩। লেখক কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাম চরিত্রে একটি অভিনব রূপ লক্ষ্য করিয়াছেন—সেটি কী ?
৪। কৃত্তিবাসী রামায়ণ বঙ্গীয় গৃহস্থের এত আদরের বস্তু হইয়াছে কেন ?
৫। কৃত্তিবাস কোন্ সময়ে, কাহার রাজত্বকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ?
৬। দানের পরিবর্তে কৃত্তিবাস রাজার নিকটে কি প্রার্থনা করিয়াছিলেন ? তিনি সফলকাম হইয়াছিলেন কি ?
৭। কেদার খাঁ কে ছিলেন ?
৮। কৃত্তিবাসকে কবিরূপে বরণ করিয়া কে চন্দনের ছড়া দিয়াছিলেন ?
৯। গৌড়েশ্বর কৃত্তিবাসকে কোন্ রচনার ভার দিয়াছিলেন ?
১০। কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল কখন ?

[গ] রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণকে ঠিক বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ বলা যায় না। —এই মন্তব্যের স্বপক্ষে দুই-একটি উদাহরণ দিয়া বক্তব্য প্রমাণ কর।

২। 'একটি অভিনব বস্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে পাই।'—কি সে অভিনব বস্তু, লেখকের অনুসরণে উদাহরণসহ ব্যক্ত কর।

৩। 'শৌর্যই পুরুষের সৌন্দর্য, কমনীয়তা নহে'—এই কথা কাহার রামায়ণে ফুটিয়াছে, উদাহরণসহ প্রমাণ দাও।

৪। 'শ্রীরামচন্দ্রের সেই চিত্র অতি ভীষণ'—কোন্ চিত্র তাহা বর্ণনা কর।

৫। 'কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই সকল ছবির যথাযথ প্রতিকৃতি উঠে নাই'—সে ছবিগুলির নামোল্লেখ কর।

৬। রাজদরবারে কৃত্তিবাস সম্পর্কে যে ধারণা পাইলে তাহা নিজের ভাষায় ব্যক্ত কর।

৭। 'বঙ্গ সাহিত্যে সে এক শুভ মুহূর্ত।'—কোন্ মুহূর্ত? 'শুভ' কথাটির উপর লক্ষ্য রাখিয়া ব্যাপারটি বুঝাইয়া নিজের ভাষায় লেখ।

[ঘ] ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ

১। 'তাঁহার ক্রোধে ভাবী রাক্ষস-সংহারের ছায়া পড়িয়াছে।' প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর।

২। 'বাঙালীর নিজ ভাবধারা ঈষৎ পরিবর্তিত ও নবরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কৃত্তিবাসের রামায়ণ বঙ্গীয় গৃহস্থের এত আদরের বস্তু হইয়াছে।' —'পরিবর্তিত' ও 'নবরূপে প্রতিষ্ঠিত' কথা দুইটির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উদ্ধৃত মন্তব্যটি বুঝাইয়া দাও।

৩। 'সেই সময় পঞ্চগৌড়েশ্বরের মুকুটের সর্বশ্রেষ্ঠ হীরকটি হইতে কবির মস্তকশোভী বাণীপ্রদত্ত নির্মাল্য আমাদের চক্ষে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছিল।'—প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর।

৪। 'সেই রাজা কে ছিলেন জানিতে চাহিতেছি'।—প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর।

[ঙ] ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ

১। শব্দার্থ লিখ ঃ চিত্রালেখ্য, স্বল্পায়তন, লিপ্ত, উপাধান, করাল, পদাঙ্ক, সমুদ্যত, অসম্বদ্ধ, প্রলাপোক্তি, ককুদ্মান, বালেন্দুশীর্ষ, ব্রীড়াবনত, দীপাধার, নির্মাল্য।

২। বাক্য রচনা কর ঃ দেবোপম, শৌর্য, গদ্গদনাদী, অসম্বদ্ধ, ককুদ্মান, ব্রীড়াবনত, প্রতিগ্রহ, নির্মাল্য।

৩। সমাস নির্ণয় কর : বজ্রবৎ, ধনুকপাণি, গদগদনাদী, পম্পাবারি, ব্রীড়াবনত, প্রলাপোক্তি, প্রতিবিম্বিত, অকাতর, হিতসাধন, পদ্মসম্পীড়িত।

৪। কারক-বিভক্তি নির্ণয় কর : উপাধানে, ভুজের, মতানুসারে, নির্জনে, প্রকৃতিকে, ভুজবলে।

৫। সন্ধি বিচ্ছেদ কর : প্রেমাশ্রুপূর্ণ, মতানুসারে, পদাঙ্ক, ব্রীড়াবনত, গৌড়েশ্বর।

৬। পদ পরিবর্তন কর : লিপ্ত, শৌর্য, সৌন্দর্য, কমনীয়তা, মাধুরী, পূর্ণতা, পরিবর্তিত।

৭। চলিত ভাষায় রূপান্তরিত কর :
'মিতব্যয়ী বণিক ক্ষুদ্র……স্মৃতির সঙ্গে জড়িত।'

৮। পাঠ্য অনুসারে ভ্রম সংশোধন কর :
প্রকৃতই যদি রামের অঙ্গুলি কমল কিশলয়োপম হইত, ও চাঁপা নাগেশ্বর দিয়া রামের নুড়ো বাঁধা থাকিত, তবে কি বিভীষণ বধ হইত, না এখনকার ঐতিহাসিকদের মতানুসারে আর্যভুজবলে লঙ্কা বিজয় হইত?

৯। টীকা লেখ : ফটোগ্রাফ, মারীচ।

১০। যথাযোগ্য শব্দসহ শূন্যস্থান পূর্ণ কর :
বাল্মীকির শ্রীরামচন্দ্র দেবতা নহেন, —।
কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাম — — —।
রাম ও লক্ষ্মণের —।
গৃহস্থ বধূর ন্যায় — —।

১১। প্রদত্ত স্তবকটি পাঠ করিয়া, নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :
যে গৌড়েশ্বরের পঞ্চ-গৌড়ব্যাপী·· হিতসাধন করিয়াছিলেন।

১। সম্মান প্রদানের ব্যাপারে রাজা ধন্য, না কবি কৃত্তিবাস ধন্য হইয়াছিলেন?

২। কবির মস্তকশোভী নির্মাল্য গৌড়েশ্বরের মুকুটের সর্বশ্রেষ্ঠ হীরক হইতে উজ্জ্বলতর হইয়াছিল কেন?

৩। অমাত্য কেদার খাঁর হস্ত পবিত্র হইয়াছিল কোন্ গূঢ় অর্থে?





[মুর্শিদাবাদ—নবাবের অন্তঃপুর।
সিরাজদ্দৌলার প্রবেশ]

লুৎফউন্নিসা—ন বা ব… জাঁহাপনা! একি, স্বর্ণকান্তি এমন শ্রীহীন কেন নবাব!

সিরাজ—নবাব কে…কারে নবাব বলছ? বি দ্রো হী, বিদ্রোহী—চতুর্দিকে বিদ্রোহী! রাজা, প্রজা, অমাত্য-নফর, ছোট বড় সকলেই শত্রু, সকলেই বিদ্রোহী, এখানেও বিদ্রোহীর প্রভাব। ঐ শোন—প্রজারা "জয় কোম্পানী বাহাদুরের জয়" বলে উচ্চনাদ কচ্ছে।…রাজপুরে ঘসেটী বেগম শত্রু, নগরে প্রজা শত্রু, অমাত্য-বান্ধব শত্রুর সহায়; আমি তোমার নিকট বিদায়

নিতে এসেছি, এই নিশীথেই নগর পরিত্যাগ করব। গুপ্ত পথে পলায়ন করতে হবে, নচেৎ যে সন্ধান পাবে, সেই শত্রুকে সংবাদ দেবে!

লুৎফ—আমি রাজপুরে থাকবো! অচিরে রাজপুরী শত্রুকরগত হবে, তোমার মহিষী হয়ে শত্রুর অধীন হবো? শত্রুর কুবচন সহ্য করবো? তুমি চলে যাবে, তুমি বনপথে ভ্রমণ করবে, আমি রাজপুরে থাকবো?

সিরাজ—তবে চলো—শীঘ্র প্রস্তুত হও, আর একদণ্ড বিলম্বের অবসর নাই, গভীর রজনী—এই উত্তম সুযোগ।

[লছমন সিংহের প্রবেশ]

লছমন—জনাব, মার্জনা আজ্ঞা হয়, বিনা অনুমতিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছি। সেনাপতি মোহনলাল নিরুদ্দেশ। শত্রু আগত প্রায়! দুটি উট প্রস্তুত আছে, যত শীঘ্র পারেন পলায়ন করুন।

সিরাজ—লছমন সিংহ, ভাণ্ডার শূন্য করে অর্থ দান করেছি, সকলে শপথ করে অর্থ গ্রহণ করেছে, কিন্তু একজনও কি আমার পক্ষে অস্ত্র ধারণ করতে প্রস্তুত নয়?

লছমন—না জনাব, শত্রুর চর সকলকেই বিমুখ করেছে, ঘসেটী বেগম গুপ্তধন বিতরণ করে সকলকে আপনার পক্ষ ত্যাগ করতে উত্তেজিত করেছে। কথার সময় নাই, পলায়ন করুন।

সিরাজ—লুৎফউন্নিসা, আর বিলম্ব করো না। তোমার রত্নাদি যা কিঞ্চিৎ থাকে, শীঘ্র নিয়ে এসো।

[লুৎফউন্নিসার প্রস্থান]

লছমন—জনাব, শীঘ্র আসুন, আমি গুপ্তদ্বারের নিকট উট নিয়ে যাই।

সিরাজ—লছমন সিংহ, তোমার রাজভক্তিই তোমার পুরস্কার। আমি আর নবাব নই, তোমায় কি পুরস্কার প্রদান করবো, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন—ঈশ্বর-কৃপায় চিরজীবন অসহায়কে সাহায্য প্রদান করো।

লছমন—জনাব, আর জীবনে সাধ নাই। যদি প্রাণদানে জনাবকে সিংহাসন দিতে পারতেম জীবন সার্থক জ্ঞান করতেম। হায়, কেন পলাশী ক্ষেত্রে মীরমদনের পার্শ্বে শয়ন করি নাই!

[লছমন সিংহের প্রস্থান এবং অন্যদিক হইতে করিম চাচার প্রবেশ]

সিরাজ—কে ও?

করিম—কেউ নয় বল্লেই পারেন; তবে কি জানেন, আমিও বাঙ্গালী, বঙ্গদেশে আমার জন্ম, সকলে সুসময়ে জনাবের নিকট বক্‌শিস নিয়েছি,

এই দুঃসময়েও বকশিস নিতে এসেছি, আর কখনো তো পিত্যেশ রইলো না। নবাবী সিংহাসন নিয়ে সকলে কাড়াকাড়ি কচ্ছে, নবাবী পরিচ্ছদটি আমার চাই, এই জন্য এসেছি। তা অমনি নিচ্ছিনে, বদলা-বদলি। এই পাগড়ি নিন, আপনার পাগড়ি দিন ; এই চোগাচাপকান নিয়ে আপনার চোগাচাপকান আমায় দিন। আর এই পাজামাটাও পরুন।

সিরাজ—করিম চাচা, এ সময়েও তুমি বন্ধু, এ সময়েও তুমি আমায় আশ্রয় দান করতে এসেছ! আমার দৈব বিড়ম্বনা, তাই তোমায় মন্ত্রিত্ব প্রদান করিনি, তোমায় নিয়ে কৌতুক করেছি। করিম, আর দেখা হবে না।

করিম—সেইটে বুঝেই পোশাকটা নিতে এসেছি, নইলে দুদিন র'য়ে বসে নিতুম।

[বেশ পরিবর্তন করিয়া]

সিরাজ—চাচা চল্লেম, সেলাম!

করিম—সেলাম!

[সিরাজের প্রস্থান]

করিম—একটা পাজামা পেলে ঠিক হতো, একটু বেশাট হচ্ছে। না, ঐ যে নবাব ছেড়ে দিয়ে গেছে—নিই, ঐটে পরে নবাব হয়ে সদর দোর দিয়ে বেরুই। নবাব হয়ে দাঁড়াই। (নিজের পাদুকার দিকে লক্ষ্য করিয়া) এই তো বাবা, বেফাঁস হয়ে গেল, জুতো জোড়াটার মর্যাদা বুঝলাম না ; করিম চাচা, তোমার মেধা বড় কম। ইংরেজদের পায়ে বুট জুতো দেখেও জুতোর মর্যাদা শিখলে না! অনেক বাঙালী ভায়াকেই বুটের মর্যাদাটা ঠেকে শিখতে হবে—না হয় তোমার বরাতে হলো না, কি করবে। নবাব জুতো খেয়ে বিদায় হলো, জুতোর চোটে না ধরা পড়ে।

অনুশীলনী

পাঠ-সংকেত ঃ স্বাধীন বাংলার এ এক অন্তিম চিত্র। বাংলার বিখ্যাত নাট্যকার ও নটশ্রেষ্ঠ গিরিশচন্দ্র এই দৃশ্যে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের একটি অসহায়, হতাশার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সেদিন চারিদিকে তাঁহার শত্রু। প্রবঞ্চিত হইয়াছেন স্বার্থান্ধ মানুষদের দ্বারা। তাহারই মধ্যে দুই-একটি স্বার্থলেশহীন সামান্য মানুষের মধ্যে দুর্লভ অসামান্যতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। বোঝা যায়—বাংলার স্বাধীনতা শেষ হইতে চলিলেও বাঙালী শেষ হয় নাই কি হিন্দু,

কি মুসলমান। করিম চাচা কি ভাবে ছদ্মবেশ পরাইয়া সিরাজের পলায়নে সাহায্য করিতে আসিয়াছিল এবং ভাঁড়ের মত তাহার কথাবার্তা, বিশেষ ভাবে আলোচ্য। ঘটনাটিকে আনন্দের মধ্য দিয়া মর্মগ্রাহী করিবার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা অংশটি অভিনয়োপযোগী।

[ক] **মৌখিক প্রশ্ন ঃ**

১। এই নাট্যাংশের লেখক কে? তাঁহার সম্বন্ধে কি জান?

২। লুৎফউন্নিসা কে ছিলেন?

৩। 'কোম্পানী বাহাদুরের জয়'—এখানে কোম্পানী বাহাদুর কে?

৪। লছমন সিংহ কে?

৫। পোশাক পরিবর্তনে করিম চাচার উদ্দেশ্য কি?

৬। 'নবাব…জুতোর চোটে না ধরা পড়ে।'— কথাটির মানে কি?

[খ] **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

১। 'শীঘ্র প্রস্তুত হও, আর একদণ্ড বিলম্বের অবসর নাই।'—বক্তা কে? কাহাকে বলা হইয়াছে? কেন বিলম্বের অবসর নাই? বক্তা কোন্ উদ্দেশ্যে একথা বলিতেছেন?

২। 'জনাব, আর জীবনে সাধ নাই।'—বক্তা কে? বক্তা কেন এ-কথা বলিতেছে?

৩। 'এ সময়েও তুমি বন্ধু, এ সময়েও তুমি আমায় আশ্রয় দান করতে এসেছ?'—বক্তা কে? কাহাকে বলা হইয়াছে? 'আশ্রয় দান' কথাটির তাৎপর্য কি?

[গ] **রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

১। পলায়নোন্মুখ সিরাজের তৎকালীন পরিবেশটি নিজের ভাষায় লেখ।

২। 'তোমার মহিষী হয়ে শত্রুর অধীন হবো!' এই কথার দ্বারা তাঁহার কিরূপ চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে লেখ।

৩। 'ঈশ্বর কৃপায় চিরজীবন অসহায়কে সাহায্য প্রদান ক'রো।'—যাহার সম্বন্ধে এ মন্তব্য, তাহার চরিত্র কিরূপ, নিজের ভাষায় লেখ।

৪। 'নবাব জুতো খেয়ে বিদেয় হলো, জুতোর চোটে না ধরা পড়ে।'—নিজের ভাষায় কথাটির তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও।

৫। করিম চাচার চরিত্রটি নিজের ভাষায় লেখ।

[ঘ] **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :**

১। 'হায়, কেন পলাশী ক্ষেত্রে মীরমদনের পার্শ্বে শয়ন করি নাই।' প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও।

২। 'নবাবী সিংহাসন নিয়ে সকলে কাড়াকাড়ি করছে, নবাবী পরিচ্ছদটি আমার চাই, এইজন্য এসেছি। তা অমনি নিচ্ছিনে, বদলা-বদলি।' প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ইহার তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও।

৩। 'সেইটি বুঝেই পোশাকটা নিতে এসেছি, নইলে দুদিন রয়ে বসে নিতুম।' ব্যাখ্যা কর।

৪। 'অনেক বাঙালী ভায়াকেই বুটের মর্যাদাটা ঠেকে শিখতে হবে।'—কথাটির প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও।

৫। 'করিম চাচা, তোমার মেধা বড় কম।' প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া কথাটির তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও।

[ঙ] **ব্যাকরণগত প্রশ্ন :**

১। শব্দার্থ ও বাক্য রচনা কর : জাঁহাপনা, স্বর্ণকান্তি, নিরুদ্দেশ, বিড়ম্বনা, জনাব, বেশাট, নফর, পিত্যেশ, চোগাচাপকান।

২। টীকা লেখ : কোম্পানী বাহাদুর, ঘসেটী বেগম, মীরমদন, মোহনলাল।

৩। সমাস নির্ণয় কর : স্বর্ণকান্তি, রাজপুর, ঈশ্বরকৃপা, নিরুদ্দেশ।

৪। কারক-বিভক্তি নির্ণয় কর : আঁচরে, অন্তঃপুরে, রাজপুরে।

৫। পদ পরিবর্তন কর : নিরুদ্দেশ, বিড়ম্বনা, আশ্রয়, মন্ত্রিত্ব।

৬। সাধু ভাষায় পরিবর্তন কর :

কেউ নয় বল্লেই……রইল না।

রামমোহন ও নবযুগ

শিবনাথ শাস্ত্রী





১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রাধানগর গ্রামে রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা রামকান্ত রায় শৈশবে তাঁহাকে নিজভবনে সামান্যরূপে শিক্ষা দিয়া ৯।১০ বৎসর বয়সের সময়ে পারসী ও আরবী ভাষা শিক্ষার জন্য পাটনা নগরে প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি ১৫-১৬ বৎসর পর্যন্ত থাকিয়া পারসী ও আরবীতে সুশিক্ষিত হন। এরূপ জনশ্রুতি যে, পাটনা বাসকালে কোরান পাঠ করিয়া হিন্দু-দিগের প্রচলিত পৌত্তলিকতার

প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধা জন্মে। ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি ঐ পৌত্তলিক প্রণালীর দোষকীর্তন করিয়া পারসীতে এক গ্রন্হ রচনা করেন। তাহা লইয়া নাকি তাঁহার পিতার সহিত মনান্তর ঘটে। সেই মনান্তরনিবন্ধন তিনি পিতৃভবন পরিত্যাগ পূর্বক সন্ন্যাসী ফকীরদের সঙ্গে দেশভ্রমণে বহির্গত হন। নানা দেশ ও নানা তীর্থ পর্যটন করিয়া অবশেষে তিব্বতদেশে উপস্হিত হন। সেখানে বৌদ্ধমতাবলম্বীদিগের কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করাতে তাহারা তাঁহার প্রাণহানি করিতে উদ্যত হয়। তখন তিনি তিব্বতবাসিনী কতিপয় রমণীর সাহায্যে রক্ষা পাইয়া স্বদেশে পলাইয়া আসেন। আসিয়া কাশীধামে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তাঁহার পিতার সহিত তাঁহার পুনরায় সম্মিলন হয়। পিতা তাঁহাকে স্বদেশে ফিরাইয়া আনেন এবং বিষয়কর্মে প্রবৃত্ত করেন। পিতার আদেশে দ্বাবিংশতিবর্ষ বয়ংক্রমকালে তিনি স্বীয় চেষ্টাতে ইংরাজী ভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং ইংরাজ গবর্নমেণ্টের অধীনে চাকুরী স্বীকারপূর্বক রামগড়, ভাগলপুর প্রভৃতি স্হানে কিছুদিন কর্ম করিয়া অবশেষে রঙ্গপুরের ক্যালেক্টর ডিগ্‌বী সাহেবের সেরেস্তাদার বা দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। পরে দশ বৎসর বিষয়কর্ম করিয়া তিনি ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা নগরে আসিয়া স্হায়ীরূপে বাস করেন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত ভূমিকা

তিনি কলিকাতাতে পদার্পণ করিবামাত্রই অগ্রসর, উদার, চিন্তাশীল ও সংস্কার-প্রয়াসী কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলেন। তিনি এই সকলকে লইয়া ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে 'আত্মীয়-সভা' নামে একটি সভা স্হাপন করিলেন। তাহাতে বেদান্তধর্মের ব্যাখ্যা ও বিচার হইত। এই শাস্ত্রীয় বিচারে শহরের অনেক বড় বড় লোক মধ্যে মধ্যে উপস্হিত থাকিতেন।

একদিকে যেমন আত্মীয়-সভার অধিবেশন ও শাস্ত্রীয় বিচারাদি চলিল, অপর দিকে তেমনি একেশ্বরবাদ প্রতিপাদন করিয়া তাঁহার গ্রন্হের পর গ্রন্হ প্রকাশিত হইতে লাগিল।

তন্নিবন্ধন তাঁহার প্রতি স্বদেশবাসিগণের বিদ্বেষ এতদূর বর্ধিত হইয়াছিল যে, ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে যখন মহাবিদ্যালয় বা হিন্দু কলেজ স্হাপিত হয়, তখন শহরের ভদ্রলোকগণ তাঁহার সহিত এক কমিটিতে কার্য করিতে সম্মত হন নাই। রামমোহন রায় উক্ত বিদ্যালয়ের কমিটি

হইতে তাড়িত হইয়া নিজে ধর্মানুমোদিত শিক্ষা দিবার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে কমিটি অব্ পাবলিক ইনষ্ট্রাক্শন নামে একটি কমিটি স্থাপিত হয়। এই কমিটি তদানীন্তন প্রাচ্যশিক্ষা-পক্ষপাতীদিগের পরামর্শে কলিকাতাতে একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করা স্থির করেন। রাজা রামমোহন রায় দেখিলেন এদেশীয়দিগের শিক্ষার জন্য যে এক লক্ষ টাকা নির্দিষ্ট ছিল তাহার সমগ্র কেবল প্রাচ্যশিক্ষার উৎসাহদানেই ব্যয়িত হইতে চলিল। তখন তিনি এই কার্যের প্রতিবাদ করিয়া তদানীন্তন গবর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট বাহাদুরকে এক পত্র লিখিলেন। ঐ পত্রে তিনি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন, এশীয়দিগকে ইংরাজী ভাষা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা না দিলে, ইহাদের জাতীয় জীবনে উন্নতি হইবে না। এই বিষয় লইয়া রাজপুরুষদিগের মধ্যে এবং দেশের বড়-লোকদিগের মধ্যে দুইটি দল হইয়া পড়িল। একদল বলিতে লাগিলেন, প্রাচীন যাহা ছিল তাহাই ভাল, তাহাই রাখিতে হইবে। আর একদল বলিতে লাগিলেন, প্রাচীনের কিছুই ভাল নয়, যাহা কিছু প্রাচ্য সকলি মন্দ, যাহা কিছু প্রতীচ্য সকলি ভাল। এই দ্বিতীয় দল এই সময় হইতে বঙ্গদেশে প্রবল হইয়া উঠিল।

প্রাচীন পক্ষাবলম্বিগণ একদিকে অতিরিক্ত মাত্রাতে যাওয়াতে এই সন্ধিক্ষণে নবীন পক্ষপাতিগণও অপরদিকে অতিরিক্ত মাত্রাতে গিয়াছিলেন।

সতীপ্রথা নিবারণে ভূমিকা

এ দেশে ইংরাজ রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই ইংরাজ রাজপুরুষ-গণের দৃষ্টি নৃশংস সহমরণ প্রথার উপর পতিত হইয়াছিল। পাছে এ দেশের লোকের ধর্ম বা সামাজিক বিষয়ে হস্তার্পণ করিলে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হয়, এই ভয়ে সংকুচিত থাকিতেন, সুতরাং তাহাদের চক্ষের সমক্ষে শত শত বিধবাকে মৃত পতির চিতানলে দগ্ধ করা হইত, তাঁহারা দেখিয়াও দেখিতেন না। অবশেষে সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি একটু দৃঢ়তর রূপে স্থাপিত হইলেই এই প্রথা নিবারণের জন্য অনুভব করিতে লাগিলেন।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুলাই গভর্নর জেনারেলের প্রাইভেট সেক্রেটারী বিধবাদিগকে যাহাতে বলপূর্বক দাহ করা না হয় তাহার উপায় বিধান করিবার জন্য তৎকালীন নিজামত আদালতকে এক পত্র লিখিয়া-

ছিলেন। নিজামত আদালতে ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য নামে একজন কোর্ট পন্ডিত ছিলেন। তাঁহাকে সহমরণ বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্ন করা হইল। ভট্টাচার্য বলিলেন, বিধবাকে পতির চিতার সহিত বাঁধিয়া দেওয়া শাস্ত্র ও সদাচার বিরুদ্ধ।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে গবর্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এই প্রথা বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। অনুসন্ধান কার্য শেষ হইলে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি কড়াকড়ি রাজ্যবিধি প্রণীত হইল। আদেশ প্রচার হইল যে, সহগমনার্থিনী বিধবাকে অগ্রে ম্যাজিস্ট্রেট বা অন্য কোন রাজ-কর্মচারীর নিকট অনুমতি পত্র লইতে হইবে। এই বিধি প্রচার হইলেই হিন্দুসমাজ মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। বহু সহস্র লোকের স্বাক্ষর করাইয়া পূর্বোক্ত রাজবিধি রহিত করিবার জন্য আবেদনপত্র প্রেরিত হইল। এই সময় রামমোহন রায় এই বিবাদের রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। শাস্ত্রানুসারে সহমরণ যে হিন্দু বিধবার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য নয় তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি লেখনী ধারণ করিলেন; তিনি বাঙ্গলা ও ইংরাজীতে পুস্তিকা লিখিয়া প্রচার করিলেন; এবং পূর্বোক্ত আবেদনপত্রের প্রতিবাদ করিয়া ও গবর্নমেণ্টকে ধন্যবাদ দিয়া এক আবেদনপত্র গবর্নর জেনারেলের নিকট প্রেরণ করিলেন। ইহাও প্রাচীন সমাজের লোকের তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইবার একটি প্রধান কারণ হইল। যখন এইরূপ সংগ্রাম চলিতেছে তখন ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর মহামতি লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক সতীদাহ নিবারণ করিয়া এক আদেশ প্রচার করিলেন।

রামমোহন রায় ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড আমহার্স্টকে যে পত্র লেখেন, তাহাকেই এই নবযুগের প্রথম সামরিক শঙ্খধ্বনি মনে করা যাইতে পারে। তিনি যেন স্বদেশবাসীদিগের মুখ পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে ফিরাইয়া দিলেন। তবে স্মরণীয় যে, তাঁহাতে যাহা ছিল অপর কোনও নেতাতে তাহা হয় নাই। তিনি নবীনের অভ্যর্থনা করিতে গিয়া প্রাচীন হইতে পা তুলিয়া লন নাই। হিন্দু জাতির কোথায় মহত্ত্ব তিনি তাহা পরিষ্কার রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং তাহা সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন, অথচ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, পাশ্চাত্য নীতি ও পাশ্চাত্য জনহিতৈষণাকে অনুকরণীয় মনে করিয়াছিলেন।

১৮৩৩ সালে রামমোহন রায় ইংলণ্ডের ব্রিস্টল নগরে ২৭শে সেপ্টেম্বর দেহত্যাগ করেন।

অনুশীলনী

পাঠ-সংকেত : এই রচনাংশে রামমোহনের সমাজসংস্কারক, ধর্মে বেদান্ত আশ্রিত একেশ্বরবাদ প্রচার ও পৌত্তলিকতা বিরোধিতা ও বিদ্যোৎসাহী প্রতিভার পরিচয় সমুজ্জ্বল। নিজেদের ভ্রান্তি, অজ্ঞতা ও প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তার জন্যই কুসংস্কারে আচ্ছন্ন বাঙালী সমাজ সেদিন তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। নানা ভাবে আঘাত ও অপমান করিয়াছে। কিন্তু নির্ভীক রামমোহন সে সব গ্রাহ্য না করিয়া ভবিষ্যৎ উন্নত এক সমাজ, দেশ ও চরিত্রের ভিত্তি গড়িয়া গিয়াছেন। এই কারণে তিনি নবযুগের উদ্গাতা।

[ক] **মৌখিক প্রশ্ন**

১। 'রামমোহন ও নবযুগ' রচনার রচয়িতা কে ?
২। কত খৃষ্টাব্দে, কোথায় রামমোহন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ?
৩। পিতার সহিত রামমোহনের বিরোধ হইল কেন ?
৪। তিব্বতে রামমোহনের প্রাণনাশের চেষ্টা হইয়াছিল কেন ?
৫। রামমোহনের মৃত্যু কোথায়, কত খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল ?

[খ] **সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন :**

১। কোথায় রামমোহন পারসী ও আরবী ভাষা শিক্ষা করেন ? তখন তাঁহার বয়স কত ?
২। পিতার সহিত রামমোহনের মনান্তর ঘটে কেন ?
৩। রামমোহন সংস্কৃত শিক্ষা কোথায় করেন ?
৪। কিরূপে রামমোহন ইংরাজিভাষা অধিগত করেন ?
৫। কত খৃষ্টাব্দে রামমোহন কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন ?
৬। 'আত্মীয় সভা' কত খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ?
৭। ইংরাজ অধিকারের প্রথম দিকে কেন তাহারা সতীপ্রথার বিরুদ্ধে আইন করেন নাই ?
৮। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে সতীদাহপ্রথা সম্পর্কে ইংরাজরা কোন্ আইন প্রবর্তন করিল ?
৯। সতীপ্রথা কোন খৃষ্টাব্দে রদ হইল ?

[গ] **রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :**

১। রামমোহন কেন পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থক ছিলেন ?
২। শিক্ষা, সমাজ-প্রথা ও ধর্মের ব্যাপারে প্রাচীন ও নবীন পক্ষাবলম্বিগণের বিরোধটি নিজের ভাষায় বর্ণনা কর। ইহার মধ্যে রামমোহনের প্রগতিশীলতার কোন লক্ষণ দেখিতে পাও কি ?

৩। 'শত শত বিধবাকে মৃতপতির চিতানলে দগ্ধ করা হইত, তাঁহারা দেখিয়াও দেখিতেন না।'—কাহারা দেখিতেন না। কেন দেখিতেন না—বুঝাইয়া বল।

৪। সতীদাহ প্রথা রহিতের ব্যাপারে রামমোহনের ভূমিকা কতটা, উল্লেখ কর।

৫। রামমোহনের মহত্ত্ব বিষয়ে নিবন্ধ লেখকের অনুসরণে নিজের ভাষায় বুঝাইয়া লেখ।

[ঘ] **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ**

১। 'নবীন পক্ষপাতীগণও অপর দিকে অতিরিক্ত মাত্রাতে গিয়াছিলেন।' —এই মাত্রাতিরিক্ত ব্যাপারটি ঘটিল কেন, প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া লেখ।

২। 'তাহাকেই এই নবযুগের প্রথম সামরিক শঙ্খধ্বনি মনে করা যাইতে পারে।' —কোন্ প্রসঙ্গে এই মন্তব্য, তাৎপর্য বুঝাইয়া নিজের ভাষায় লেখ।

৩। 'তাঁহাতে যাহা ছিল, অপর কোনও নেতাতে তাহা হয় নাই।'—লেখকের এই মন্তব্যের তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও।

[ঙ] **ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ**

১। অর্থ লেখ ও বাক্য রচনা কর ঃ সন্নিহিত, পৌত্তলিক, মনান্তর, সেরেস্তাদার, প্রতিপন্ন, হিতৈষণা।

২। টীকা লেখ ঃ একেশ্বরবাদ, পৌত্তলিকতা, আত্মীয় সভা, কমিটি অফ পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন, সতীদাহ প্রথা, ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য।

৩। পদান্তর কর ঃ অনুশীলন, হিতৈষণা, অনুকরণীয়, উদার, শাস্ত্র, আত্মীয়, পৌত্তলিক।

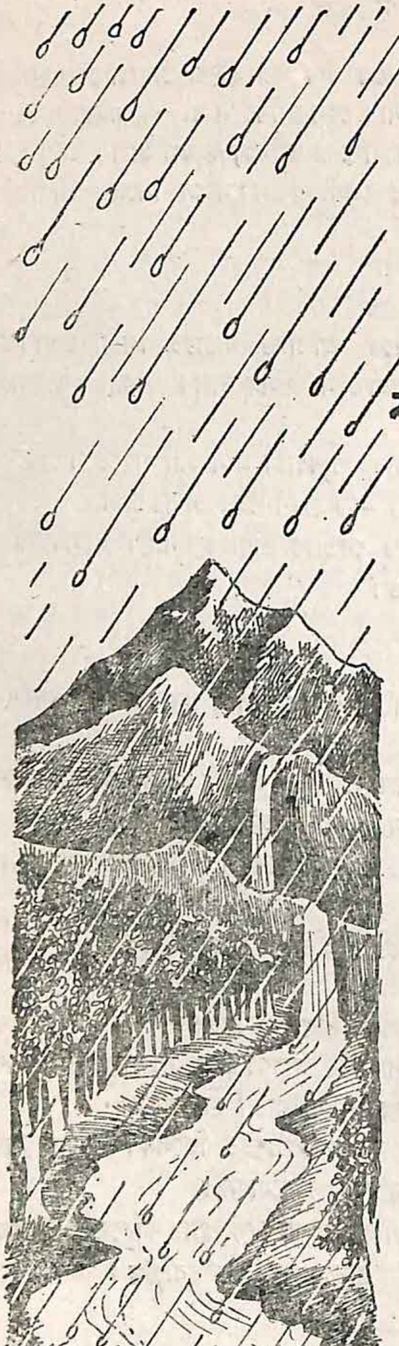
৪। কয়টি ইংরাজি শব্দ আছে বাহির কর এবং তাহার টীকা বা অর্থ লিখ।

৫। সঠিক শব্দটি বাছিয়া লও ঃ

(i) পিতা রামকান্ত রায় শৈশবে তাঁহাকে নিজভবনে সামান্য রূপে শিক্ষা দিয়া ইংরাজী / পারসী / আরবী ভাষা শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন—কলকাতায় / তিব্বতে / পাটনায় / কাশীধামে।

(ii) নিজামত আদালতে একজন কোর্টপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার নাম আমহার্স্ট / বেণ্টিঙ্ক / ঘনশ্যাম / রামমোহন।

(iii) সতীদাহ প্রথা নিবারণ করিয়া এক আদেশ প্রচার করিলেন—ইংরাজ সরকার / লর্ড আমহার্স্ট / রামমোহন / লর্ড বেণ্টিঙ্ক।



বৃষ্টি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চল নামি—আষাঢ় আসিয়াছে—চল নামি।

আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টি-বিন্দু, একা একজনে যূথিকা-কলির শুষ্ক মুখও ধুইতে পারি না—মল্লিকার ক্ষুদ্র হৃদয় ভরিতে পারি না। কিন্তু আমরা সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি,—মনে করিলে পৃথিবী ভাসাই। ক্ষুদ্র কে?

দেখ, যে একা, সেই ক্ষুদ্র, সেই সামান্য। যাহার ঐক্য নাই, সেই তুচ্ছ। দেখ ভাই সকল, কেহ একা নামিও না—অর্ধপথে ঐ প্রচণ্ড রবির কিরণে শুকাইয়া যাইবে—চল, সহস্রে সহস্রে, লক্ষে লক্ষে, অর্বুদে অর্বুদে, এই বিশোষিতা পৃথিবী ভাসাইব।

পৃথিবী ভাসাইব। পর্বতের মাথায় চড়িয়া, তাহার গলা

ধরিয়া, বুকে পা দিয়া, পৃথিবীতে নামিব ; নির্ঝর পথে স্ফটিক হইয়া বাহির হইব। নদীকূলের শূন্য হৃদয় ভরাইব ; তাহাদিগকে রূপের বসন পরাইয়া, মহাকল্লোলে ভীমবাদ্য বাজাইয়া, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ মারিয়া, মহারঙ্গে ক্রীড়া করিব। এসো, সবে নামি।

কে যুদ্ধ দিবে—বায়ু? ইস্! বায়ুর ঘাড়ে চড়িয়া দেশ দেশান্তর বেড়াইব। আমাদের এ বর্ষা যুদ্ধে বায়ু ঘোড়া মাত্র ; তাহার সাহায্য পাইলে স্থলে জলে এক করি। তাহার সাহায্য পাইলে বড় বড় গ্রাম অট্টালিকা, পোত মুখে করিয়া ধুইয়া লইয়া যাই। বায়ু! বায়ু ত আমাদের গোলাম।

দেখ ভাই, কেহ একা নামিও না, ঐক্যেই বল—নহিলে আমরা কেহ নই। চল—আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টি বিন্দু—কিন্তু পৃথিবী রাখিব। শস্য-ক্ষেত্রে শস্য জন্মাইব—মনুষ্য বাঁচিবে। নদীতে নৌকা চালাইব—মনুষ্যের বাণিজ্য বাঁচিবে। তৃণ-লতা-বৃক্ষাদির পুষ্টি করিব—পশুপক্ষী কীট-পতঙ্গ বাঁচিবে। আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু—আমাদের সমান কে? আমরাই সংসার রাখি।

তবে আয়, ডেকে ডেকে, হেঁকে হেঁকে নবনীল কাদম্বিনি! বৃষ্টি-কুলপ্রসূতি! আয় মা দিঙ্মণ্ডলব্যাপিনি, সৌরতেজঃসংহারিণি! এসো, গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন কর, আমরা নামি! এসো ভগিনি সুচারুহাসিনি চঞ্চলে। বৃষ্টিকুলমুখ আলো কর। আমরা ডেকে ডেকে, হেসে হেসে, নেচে নেচে ভূতলে নামি। তুমি বৃত্রমর্মভেদী বজ্র, তুমিও ডাক না—এ উৎসবে তোমার মত বাজনা কে? তুমিও ভূতলে পড়িবে? পড় কিন্তু কেবল গর্বোন্নতের মস্তকের উপর পড়িও। ওই ক্ষুদ্র পরোপকারী শস্য মধ্যে পড়িও না—আমরা তাহাদের বাঁচাইতে যাইতেছি। ভাঙ্গ ত এই পর্বতশৃঙ্গ ভাঙ্গ, ক্ষুদ্রকে কিছু বলিও না—আমরা ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রের জন্য আমাদের বড় ব্যথা।

দেখ দেখ, আমাদের দেখিয়া পৃথিবীর আহ্লাদ দেখ। গাছপালা মাথা নাড়িতেছে—নদী দুলিতেছে। ধান্যক্ষেত্র মাথা নামাইয়া প্রণাম করিতেছে—চাষা চষিতেছে—ছেলে ভিজিতেছে। কেবল বেনে বউ আমসী ও আমসত্ত্ব লইয়া পলাইতেছে। মর্ পাপিষ্ঠা! দুই একখানা রেখে যা না—আমরা খাব।

আমরা জাতিতে জল, কিন্তু রঙ্গরস জানি। লোকের চাল ফুটা

করিয়া ঘরে উঁকি মারি—গৃহে ছাদ ফুটা করিয়া ঢুঁ দিই। মল্লিকার মধু ধুইয়া লইয়া গিয়া, ভ্রমরের অন্ন মারি। মুড়ি, মুড়কি, দোকান দেখিলে প্রায় ফলার মাখিয়া দিয়া যাই। রামী চাকরানী কাপড় শুকুতে দিলে, প্রায় তাহার সব কাজ বাড়াইয়া রাখি।

তা যাক্—আমাদের বল দেখ। দেখ, পর্বত কন্দর, দেখ প্রদেশ ধুইয়া লইয়া, নূতন দেশ নির্মাণ করিব! বিশীর্ণা সূত্রাকায়া তটিনীকে কূলপ্লাবিনী দেশমর্জ্জনী অনন্তদেহধারিণী অনন্ততরঙ্গিনী জলরাক্ষসী করিব! কোন দেশের মানুষ রাখিব—কোন দেশের মানুষ মারিব—কত জাহাজ বহিব, কত জাহাজ ডুবাইব—পৃথিবী জলমগ্ন করিব—অথচ আমরা ক্ষুদ্র! আমাদের মত ক্ষুদ্র কে? আমাদের মত বলবান কে!

অনুশীলনী

পাঠ-সংকেত : বৃষ্টির বিচিত্র রূপ এই রচনায় বিধৃত। কখনো গুরু, কখনো লঘু একটু হাসির সহিত মিশ্রিত, কখনো সৃষ্টি কখনো ধ্বংসের মধ্যে তাহার প্রকাশ। সর্বাধিক গুরুত্ব এই কথাটায়—একতাই মহাশক্তি। লঘু, গুরু, সৃষ্টি, ধ্বংস, ঐক্য বল—প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার যোগ্য।

[ক] **মৌখিক প্রশ্ন :**

১। এই নিবন্ধের রচয়িতা কে? বাংলা সাহিত্যে কেন তিনি স্মরণীয়?
২। 'ক্ষুদ্র' কাহাকে বলা হইয়াছে?
৩। 'অর্বুদ' মানে কি?
৪। 'বৃত্রমর্মভেদী' শব্দে বৃত্র কে?

[খ] **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :**

১। 'ক্ষুদ্র কে?'—বক্তা কে? কাহাকে ক্ষুদ্র বলা হইয়াছে?
২। 'এই বিশোষিতা পৃথিবী ভাসাইব।'—বক্তা কে? 'বিশোষিতা' বলা হইয়াছে কেন? কিরূপে পৃথিবী ভাসাইবে? কেনই বা ভাসাইবে?
৩। 'তাহার সাহায্য পাইলে স্থলে জলে এক করি।'—বক্তা কে? এখানে কাহার সাহায্যের কথা বলা হইয়াছে? ভিন্নধর্মী স্থল ও জলকে কিভাবে এক করা যায়?
৪। 'বৃষ্টিকুলপ্রসূতি।' কাহাকে বলা হইয়াছে?

[গ] **রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

১। 'যাহার ঐক্য নাই, সেই তুচ্ছ।' পাঠ্য নিবন্ধ অনুসরণে মন্তব্যটি নিজের ভাষায় বুঝাইয়া বল।

২। 'আমাদের এ বর্ষা যুদ্ধে বায়ু ঘোড়া মাত্র ; তাহার সাহায্য পাইলে স্থলে জলে এক করি।' এই বক্তব্যের একটি পরিণাম চিত্র অংকিত কর।

৩। 'দেখ দেখ, আমাদের দেখিয়া পৃথিবীর আহ্লাদ দেখ।' পৃথিবীর আনন্দের চিত্রটি নিজের ভাষায় লেখ।

৪। 'আমরা জাতিতে জল, কিন্তু রঙ্গরস জানি।' রঙ্গরসের চিত্রটি নিজের ভাষায় লেখ।

[ঘ] **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ**

১। 'দেখ, যে একা, সেই ক্ষুদ্র, সেই সামান্য।' প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর।

২। 'আমরাই সংসার রাখি।' প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর।

৩। 'আমাদের মত বলবান কে ?' বাক্যটির নিহিতার্থ পরিষ্কার করিয়া নিজের ভাষায় বুঝাইয়া দাও।

[ঙ] **ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ**

১। শব্দার্থ লেখ ঃ বিশোষিতা, আচ্ছন্ন, দিঙ্মণ্ডলব্যাপিনী, গর্বোন্নত, বিশীর্ণা, সূত্রাকারা, সৌরতেজসংহারিণী, গর্বোন্নত।

২। সমাস নির্ণয় কর ঃ নবনীল, বৃত্রমর্মভেদী, গর্বোন্নত, সূত্রাকারা।

৩। কারক-বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ অর্ধপথে, নদীকূলের, শস্যক্ষেত্রে, ক্ষুদ্রকে, শস্য মধ্যে।

৪। পদ পরিবর্তন কর ঃ ঐক্য, তুচ্ছ, তরঙ্গ, দোকান, ভণ্ড, কুলপ্লাবিনী।

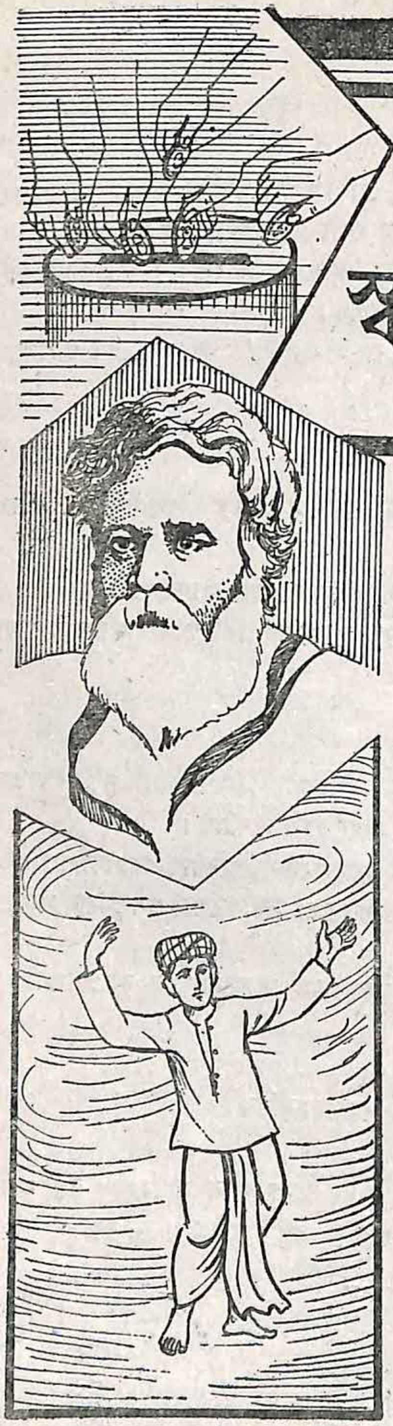
৫। টীকা লেখ ঃ বৃত্রমর্মভেদী।

৬। চলিত ভাষায় লেখ ঃ

নদীকূলের শূন্য হৃদয়······ক্রীড়া করিব।

৭। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

আয় মা ··· সৌরতেজ সংহারিণি ! এসো, গগন মণ্ডল ·· কর, আমরা নামি ! এসো ভগিনী ··· চঞ্চলে ! বৃষ্টি কুল মুখ ··· কর।



প্রথম স্বদেশী উদ্দীপনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। আমার পিতাকে তাঁহার কোন নূতন আত্মীয় ইংরাজীতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে-পত্র লেখকের নিকটে তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল।

আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার কর্ম-কর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। এই মেলায়

দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।

জ্যোতিদাদার উদ্‌যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল, বৃদ্ধ রাজনারায়ণবাবু (বসু) ছিলেন তাহার সভাপতি। ইহা স্বাদেশিকের সভা। কলিকাতার এক গলির মধ্যে এক পোড়ো বাড়িতে সেই সভা বসিত। দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋক্‌ মন্ত্রে, কথা আমাদের চুপিচুপি—ইহাতেই সকলের রোমহর্ষণ হইত। আমার মত অর্বাচীনও এই সভার সভ্য ছিল। সেই সভায় আমরা এমন একটি খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম যে, অহরহ উৎসাহে যেন আমরা উড়িয়া চলিতাম।

আমাদের দলের মধ্যে একটি মধ্যবিত্ত জমিদার ছিলেন। তাঁহার গঙ্গার ধারে একটি বাগান ছিল। সেখানে গিয়া আমরা সকল সভ্য একদিন জাতিবর্ণনির্বিচারে আহার করিলাম। অপরাহ্ণে বিষম ঝড়। সেই ঝড়ে আমরা গঙ্গার ঘাটে দাঁড়াইয়া চীৎকার শব্দে গান জুড়িয়া দিলাম। রাজনারায়ণবাবুর কণ্ঠে সাতটা সুর যে বেশ বিশুদ্ধভাবে খেলিত তাহা নহে কিন্তু তিনিও গলা ছাড়িয়া দিলেন, তাঁহার উৎসাহের তুমুল হাত নাড়া তাঁহার ক্ষীণ কণ্ঠকে বহু দূরে ছাড়াইয়া গেল; তালের ঝোঁকে মাথা নাড়িতে লাগিলেন এবং তাঁহার পাকা দাড়ির মধ্যে ঝড়ের হাওয়া মাতামাতি করিতে লাগিল।

ছেলেবেলায় রাজনারায়ণবাবুর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় ছিল তখন সকল দিক হইতে তাঁহাকে বুঝিবার শক্তি আমাদের ছিল না। তখনই তাঁহার চুলদাড়ি প্রায় সম্পূর্ণ পাকিয়াছে। কিন্তু আমাদের দলের মধ্যে বয়সে সকলের চেয়ে যে ব্যক্তি ছোটো তার সঙ্গেও তাঁহার বয়সের কোনো অনৈক্য ছিল না। এমন কি প্রচুর পাণ্ডিত্যেও তাঁহার কোনো ক্ষতি করিতে পারে নাই, তিনি একেবারেই সহজ মানুষটির মতোই ছিলেন। দেশের উন্নতিসাধন করিবার জন্য তিনি সর্বদাই কতরকম সাধ্য ও অসাধ্য প্ল্যান করিতেন তাহার আর অন্ত নাই। এদিকে তিনি মাটির মানুষ কিন্তু তেজে একেবারে পরিপূর্ণ ছিলেন। দেশের প্রতি তাঁহার যে প্রবল অনুরাগ সে তাঁহার সেই তেজের জিনিস। দেশের সমস্ত খর্বতা দীনতা অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলিতে থাকিত, তাঁহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের সঙ্গে হাত

নাড়িয়া আমাদের সঙ্গে মিলিয়া তিনি গান করিতেন—গলায় সুর লাগুক আর না লাগুক সে তিনি খেয়ালই করিতেন না—

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।

স্বদেশে দিয়াশলাই প্রভৃতির কারখানা স্থাপন করা আমাদের সভার উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল। এজন্য সভ্যেরা তাঁহাদের আয়ের দশমাংশ এই সভায় দান করিতেন। দিয়াশলাই তৈরী করিতে হইবে, তাহার কাঠি পাওয়া শক্ত। খেংরা কাঠি দিয়া অনেক পরীক্ষার পর বাক্সকয়েক দিয়াশলাই তৈরি হইল। কিন্তু তাহার একটু সামান্য অসুবিধা এই হইয়াছিল যে, নিকটে, অগ্নিশিখা না থাকিলে তাহাদিগকে জ্বালাইয়া তোলা সহজ ছিল না।

খবর পাওয়া গেল, একটি কোনো অল্পবয়স্ক ছাত্র কাপড়ের কল তৈরি করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত ; গেলাম তাহার কল দেখিতে। সেটা কোনো কাজের জিনিস হইতেছে কিনা তাহা কিছুমাত্র বুঝিবার শক্তি আমাদের কাহারও ছিল না—কিন্তু বিশ্বাস করিবার ও আশা করিবার শক্তিতে আমরা কাহারও চেয়ে খাটো ছিলাম না। যন্ত্র তৈরি করিতে দেনা হইয়াছিল, আমরা তাহা শোধ করিয়া দিলাম। অবশেষে একদিন দেখি, মেট্রোপলিটান কলেজের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ব্রজবাবু (ব্রজনাথ দে) মাথায় একখানা গামছা বাঁধিয়া জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন, "আমাদের কলে এই গামছার টুকরা তৈরি হইয়াছে।" বলিয়া দুই হাত তুলিয়া তান্ডব নৃত্য! তখন ব্রজবাবুর মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে।

অনুশীলনী

পাঠ-সংকেত : ১৯শ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে বাংলা দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে একটা দেশাত্মবোধক ভাবের জাগরণ লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ সেই ভাব জাগরণের একটি চিত্র এখানে তুলিয়া ধরিয়াছেন। স্বয়ং পিতা দেবেন্দ্রনাথ এবং বাহিরে হিন্দুমেলাকে কেন্দ্র করিয়া স্বদেশী কর্মের আয়োজন ও উদ্দীপনা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বস্তু।

[ক] **মৌখিক প্রশ্ন :**

১। প্রবন্ধটির রচয়িতা কে ? তাঁহার কৃতিত্ব সম্বন্ধে কি জান ?

২। দেবেন্দ্রনাথের যে আত্মীয় ইংরাজিতে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল কেন ?
৩। 'হিন্দু মেলার' অনুষ্ঠান কিরূপ ছিল ?
৪। রাজনারায়ণ বাবুর পুরা নাম কি ?
৫। মেট্রোপলিটান কলেজের সুপারিন্টেডেণ্ট কে ছিলেন ?

[খ] **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :**

১। 'সে পত্র লেখকের নিকটে তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল।'—পত্র লেখক কে ? কেন পত্র ফিরিয়া গিয়াছিল ? পত্রটি কাহাকে লেখা হইয়াছিল ?
২। 'সেই সভায় আমরা ··· উড়িয়া চলিতাম।'—কোন সভা ? তাহা কিরূপ ছিল ? সে সভার উদ্যোক্তা কে ছিলেন ? সে সভায় কি হইত ? 'খ্যাপামি' বলা হইয়াছে কেন ?
৩। 'একটি হিন্দুমেলা সৃষ্টি হইয়াছিল।' সেই মেলার প্রকৃতি কিরূপ ছিল ? কাহারা ইহার স্রষ্টা ? কর্মকর্তা কে ছিলেন ?
৪। 'এজন্য সভ্যেরা তাঁহাদের আয়ের দশমাংশ এই সভায় দান করিতেন।'—কোন্ সভার কথা হইতেছে ? ইহার কয়েকজন সভ্যের নাম কর।
৫। 'যন্ত্র তৈরী করিতে দেনা হইয়াছিল, আমরা তাহা শোধ করিয়া দিলাম।' —কোন্ যন্ত্র ? তাহাতে কি প্রস্তুত হইয়াছিল ? কে তাহা লইয়া আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন ? কেন নৃত্য করিয়াছিলেন ?

[গ] **রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :**

১। 'ইহা স্বাদেশিকতার সভা।' সভার অবস্থান ও কর্মকাণ্ড, কয়েকজন সভ্যের নামোল্লেখ সহ নিজের ভাষায় ইহার পরিচয় দাও।
২। রাজনারায়ণ বসুর একটি সংক্ষিপ্ত চরিত্রচিত্র রচনা কর।
৩। দিয়াশলাই কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা ও পরিণাম কি হইয়াছিল, তাহা নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।
৪। সঙ্গীত সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসুর পারদর্শিতা বিষয়ে নিজের ভাষায় একটি চিত্র রচনা কর।

[ঘ] **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :**

১। 'ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়।'—ইহা কখন, কোথায় হয়, মর্ম ব্যাখ্যা করিয়া লিখ।
২। 'সেখানে গিয়া আমরা সকল সভ্য জাতিবর্ণ নির্বিচারে আহার করিলাম।' ইহার স্থানটি কোথায় ? এই আহার পর্বের গুরুত্বটা কোথায় ?

৩। 'কিন্তু বিশ্বাস করিবার ও আশা করিবার শক্তিতে আমরা কাহারো চেয়ে খাটো ছিলাম না।' ব্যাখ্যা করিয়া, প্রসঙ্গ উল্লেখ সহ, নিজের ভাষায় বুঝাইয়া দাও।

[ঙ] **ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ**

১। শব্দার্থ সহ বাক্য রচনা কর ঃ সঞ্চার, নিয়োজিত, উপলব্ধি, অর্বাচীন, অহরহ, বিভ্রম, খর্বতা, দীপ্ত।

২। বিপরীত শব্দে বাক্য রচনা কর ঃ অক্ষুণ্ণ, পুরস্কৃত, বিশুদ্ধভাবে, অনৈক্য, অনুরাগ, খর্বতা, আশা।

৩। সমাস নির্ণয় কর ঃ অক্ষুণ্ণ, কর্মকর্তা, দেশানুরাগ, হাতনাড়া, অগ্নিশিখা, অনৈক্য।

৪। কারক-বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ মেলায়, মন্ত্রে, খ্যাপামির, উৎসাহে, অপরাহ্নে।

৫। পদ পরিবর্তন কর ঃ সঞ্চার, উপলব্ধি, খর্বতা, দীপ্ত, দীক্ষা, খ্যাপামি।

৬। টীকা রচনা কর ঃ পিতৃদেব, হিন্দুমেলা, নবগোপাল মিত্র, জ্যোতিদাদা, রাজনারায়ণ বসু, ব্রজবাবু।

৭। ইংরাজি শব্দ কয়টি, খুঁজিয়া বাহির কর এবং বাংলা শব্দার্থ দাও।

৮। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ
ভারতবর্ষকে ··· বলিয়া ভক্তির সহিত ··· চেষ্টা সেই প্রথম হয় ? এই ··· দেশের স্তবগান গীত, ··· কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ··· প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী ··· পুরস্কৃত হইত।

৯। চলিত ভাষায় পরিবর্তিত কর ঃ
খবর পাওয়া গেল, একটি কোনো অল্প বয়স্ক ছাত্র কাপড়ের কল তৈরি করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত। গেলাম তাহার কল দেখিতে। সেটা কোনো কাজের জিনিস হইতেছে কিনা তা কিছুমাত্র বুঝিবার শক্তি আমাদের কাহারও ছিল না—কিন্তু বিশ্বাস করিবার ও আশা করিবার শক্তিতে আর কাহারো চেয়ে ক্ষুদ্র ছিলাম না।



বাংলা দেশের রূপ

স্বামী বিবেকানন্দ

নদীমুখ বা বন্দর হতে জাহাজ রাত্রে প্রায় ছাড়ে না… বিশেষ কলকাতার ন্যায় বাণিজ্য-বহুল বন্দর, আর গঙ্গার ন্যায় নদী। আমাদের গঙ্গার মুখে দুটি প্রধান ভয়, একটি বজবজের কাছে জেম্‌স্‌ ও মেরী নামক চোরাবালি, দ্বিতীয়টি ডায়মন্ড-হারবারের মুখে চড়া। পুরো জোয়ারে দিনের বেলায় 'পাইলট' অতি সন্তর্পণে জাহাজ চালান, নতুবা নয়। কাজেই গঙ্গা থেকে আমাদের বেরুতে দুদিন লাগলো।

আপনার লোকের একটি রূপ থাকে, তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। নিজের খাঁদা, বোঁচা ভাই বোন ছেলে মেয়ের চেয়ে গন্ধর্ব লোকেও সুন্দর পাওয়া যাবে না সত্য। কিন্তু গন্ধর্বলোকে বেড়িয়েও যদি আপনার লোককে যথার্থ সুন্দর

পাওয়া যায়, সে আহ্লাদ রাখবার কি আর জায়গা থাকে? এই অনন্ত শস্যশ্যামলা সহস্র স্রোতস্বতীমাল্যধারিণী বাংলাদেশেরএকটি রূপ আছে। বিদেশ থেকে না এলে, ডায়মণ্ডহারবারের মুখ দিয়ে গঙ্গায় প্রবেশ না করলে সে বোঝা যায় না। সেই নীল নীল আকাশ, তার কোলে কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালী কিনারাদার, তার নীচে ঝোপ-ঝোপ তাল-নারিকেল-খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ চামরের মত হেলছে, তার নীচে ফিকে ঘন, ঈষৎ পীতাভ, একটু কালো মেশানো—ইত্যাদি হরেক রকমের সবুজের কাঁড়ি চালা আঁব লিচু জাম কাঁঠাল—পাতায় পাতা—গাছ, ডালপালা আর দেখা যাচ্ছে না। আশ-পাশে ঝাড়-ঝাড় বাঁশ, হেলছে-দুলছে আর তাদের নীচে—যার কাছে ইয়ারকান্দী ইরানী তুর্কিস্হানী গালচে-দুলচে কোথায় হার মেনে যায়! সেই ঘাস—যতদূর চাও, সেই শ্যাম শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেঁটে ছুঁটে ঠিক করে রেখেছে—জলের কিনারা পর্যন্ত সেই ঘাস। গঙ্গার মৃদুমন্দ হিল্লোল যে অবধি জমিকে ঢেকেছে, যে অবধি অল্প অল্প লীলাময় ধাক্কা দিচ্ছে, সে অবধি ঘাসে আঁটা। আবার তার নীচে আমাদের গঙ্গাজল। আবার পায়ের নীচে থেকে দেখ, ক্রমে উপরে যাও, উপর উপর মাথার উপর পর্যন্ত একটি রেখার মধ্যে এত রঙের খেলা! রঙের এত রকমারি, আর কোথাও দেখেছ? বলি,—এই বেলা গঙ্গামা'র শোভা যা দেখবার দেখে নাও, আর বড় একটা কিছু থাকছে না। দৈত্য দানবের হাতে পড়ে এ সব যাবে। ঐ ঘাসের জায়গায় উঠবেন ইঁটের পাঁজা, আর নামবেন ইঁট-খোলার গর্তকুল। যেখানে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি ঘাসের সঙ্গে খেলা করছে, সেখানে দাঁড়াবেন পাট-বোঝাই ফ্ল্যাট, আর সেই গাধাবোট। আর ঐ তাল তমাল আঁব লিচুর রঙ, ঐ নীল আকাশ, মেঘের বাহার—ওসব কি আর দেখতে পাবে? দেখবে—পাথুরে কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে মাঝে ভূতের মত অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছে কলের চিমনি!

জাহাজ সমুদ্রে পড়ল। এইখানে ধলায়-কালোয় মেশামেশি, প্রয়াগের কিছু কিছু ভাব যেন!

কি সুন্দর! সামনে যতদূর দৃষ্টি যায়—ঘন নীল জল তরঙ্গায়িত, ফেনিল,—বায়ুর সঙ্গে তালে তালে নাচচে। পিছনে আমাদের গঙ্গাজল, সেই বিভূতিভূষণা, সেই "গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেঃ"। সে জল অপেক্ষাকৃত স্হির। সামনে মধ্যবর্তী রেখা। জাহাজ একবার সাদা

জলের, একবার কালো জলের উপর উঠছে।…ঐ সাদা জল শেষ হয়ে গেল। এবারে খালি নীলাম্বু, সামনে-পিছনে আশে-পাশে খালি নীল নীল নীল জল। খালি তরঙ্গভঙ্গ। নীলকেশ, নীলকান্ত অঙ্গ আভা, নীল পট্টবাস পরিধানে। কোটি কোটি অসুর দেবভয়ে সমুদ্রের তলায় লুকিয়েছিল, আজ তাদের সুযোগ, আজ তাদের বরুণ সহায়—পবনদেব সাথী। মহা গর্জন, বিরাট হুঙ্কার—ফেনময় অট্টহাস, দৈত্যকুল আজ মহোদধির উপর রণতাণ্ডবে মত্ত হয়েছে। তার মাঝে আমাদের অর্ণব-পোত। উপরে বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের জীমূতমন্দ্র, চারিদিকে শুভ্রশির তরঙ্গকুলের লম্ফঝম্ফ গুরুগর্জন, পোতশ্রেষ্ঠের সমুদ্রবল উপেক্ষাকারী মহাযন্ত্রের হুহুঙ্কার—সে এক বিরাট সম্মিলন।…চমকে চেয়ে দেখি—জাহাজ বেজায় দুলছে, আর তু-ভায়া দুহাত দিয়ে মাথাটি ধ'রে অন্নপ্রাশনের অন্নের পুনরাবিষ্কারের চেষ্টায় আছেন।

সেকেণ্ড ক্লাসে দুটি বাঙালী ছেলে পড়্‌তে যাচ্ছে। তাদের অবস্থা ভায়ার চেয়েও খারাপ। একটি ত এমনি ভয় পেয়েছে যে বোধ হয়, তীরে নামতে পারলে এক ছুটে চোঁ-চা দেশের দিকে দৌড়ায়!

তু-ভায়া 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধ শীঘ্র শীঘ্র শেষ করবার জন্য দিক্ করে তুলতেন। আজ আমিও সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ভায়া, বর্তমান ভারতের অবস্থা কিরূপ?' ভায়া একবার সেকেণ্ড ক্লাসের দিকে চেয়ে একবার নিজের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে জবাব দিলেন, 'বড়ই শোচনীয়—বেজায় গুলিয়ে যাচ্ছে।'

জাহাজ বঙ্গোপসাগরে যাচ্ছে। একে বঙ্গোপসাগর স্বভাবচঞ্চল, তাতে আবার বর্ষাকাল; মনসুনের সময়; জাহাজ খুব হেলতে দুলতে যাচ্ছেন। তবে এই তো আরম্ভ, পরে বা কি আছে!

অনুশীলনী

পাঠ-সংকেত ঃ প্রকৃতি চিত্র। অংশটি স্বামীজির ভ্রমণ কাহিনীর একাংশ। এখানে বাংলার মাটি জলের দৃশ্য এবং তাহার উপসাগরের শোভা বর্ণিত হইয়াছে। এ বর্ণনার অন্তরালে দেশের যে একটা মারাত্মক পরিবর্তনও আসিতেছে, শিল্প যুগের বিধ্বংসী একটা চেহারাও দেখা যাইতেছে—বেদনার সঙ্গে বিবেকানন্দ তাহারও ইঙ্গিত দিয়াছেন। সমগ্র বর্ণনাটির মধ্যে তাঁহার প্রগাঢ় দেশপ্রেম প্রকাশ পাইতেছে। রচনাটিতে চলিত ভাষার ওজঃগুণ লক্ষণীয়।

[ক] **মৌখিক প্রশ্ন ঃ**

১। এই নিবন্ধাংশ কাহার রচনা? তাঁহার সম্বন্ধে কি জান?

২। জায়গাটি কোথায়, মানচিত্রে দেখাও।

৩। 'জাহাজ সমুদ্রে পড়ল।' কথাটার মধ্যে কোন ভুল আছে কী?

৪। বঙ্গোপসাগরকে স্বভাবচঞ্চল বলা হইয়াছে কেন?

[খ] **সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

১। 'আমাদের গঙ্গার মুখে দুটি প্রধান ভয়।'—ভয় দুটি কি, উল্লেখ কর।

২। 'এই বেলা গঙ্গা মা'র শোভা যা দেখবার দেখে নাও, আর বড় একটা কিছু থাকছে না।'—বক্তা কে? কেন একথা বলিতেছেন? সংক্ষেপে বুঝাইয়া বল।

৩। 'প্রয়াগের কিছু ভাব যেন!'—স্থানটি কোথায়? প্রয়াগের কোন্ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে? তার প্রসঙ্গ উল্লেখ কর।

৪। 'আর তু-ভায়া দুহাত দিয়ে মাথাটি ধরে অন্নপ্রাশনের অন্নের পুনরাবিষ্কারের চেষ্টায় আছেন।'—তু-ভায়া কে? কোথায় এ ব্যাপার ঘটিতেছে? ইহার কারণ কী?

৫। 'ভায়া, বর্তমান ভারতের অবস্থা কিরূপ?'—বক্তা কে? ইহা কি শ্লেষ, না সাধারণ প্রশ্ন মাত্র? এ কথার গূঢ় ব্যঞ্জনা আছে কি?—থাকিলে তাহা কী?

[গ] **রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

১। 'আবার পায়ের নীচে…কোথাও দেখেছ?' এ বর্ণনার একটি লিপিচিত্র নিজের ভাষায় রচনা কর।

২। 'এইখানে ধলায়-কালোয় মেশামেশি, প্রয়াগের কিছু ভাব যেন!' জায়গাটির শোভা বর্ণনার একটি লিপিচিত্র নিজের ভাষায় রচনা কর।

[ঘ] **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ**

১। 'আপনার লোকের একটি রূপ থাকে, তেমন আর কোথাও দেখা যায় না।' মর্মার্থ ব্যাখ্যা কর।

২। 'দৈত্যদানবের হাতে পড়ে এ সব যাবে।' প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর।

৩। 'সে এক বিরাট সম্মিলন।'—প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর।

৪। 'ভায়া, বর্তমান ভারতের অবস্থা কিরূপ?' প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া, ইহার আপাত অর্থ ও নিহিত অর্থটি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দাও।

৫। 'কোটি কোটি অসুর দেব ভয়ে সমুদ্রের তলায় লুকিয়েছিল।' টীকা সহ ব্যাখ্যা কর।

[ঙ] **ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ**

১। শব্দার্থ ও বাক্য রচনা কর ঃ সন্তর্পণে, অনন্ত, হিল্লোল, নীলাম্বর, পট্টবাস, নিনাদ।

২। সমাস নির্ণয় কর ঃ নদীমুখ, বাণিজ্যবহুল, মাল্যধারিণী, কাঁড়িঢালা, মেলামেশি, অঙ্গশোভা, অর্ণবপোত।

৩। কারক-বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ সন্তর্পণে, বাতাসে, রণতাণ্ডবে, ফেণময়, যন্ত্রযোগে, দেবভয়ে।

৪। পদ পরিবর্তন কর ঃ সোনালী, হিল্লোল, নিনাদ, সাদাটে, বাহার।

৫। সাধুভাষায় লেখ ঃ সেকেণ্ড ক্লাশে দুটি বাঙালী ছেলে····· দেশের দিকে দৌড়ায়।

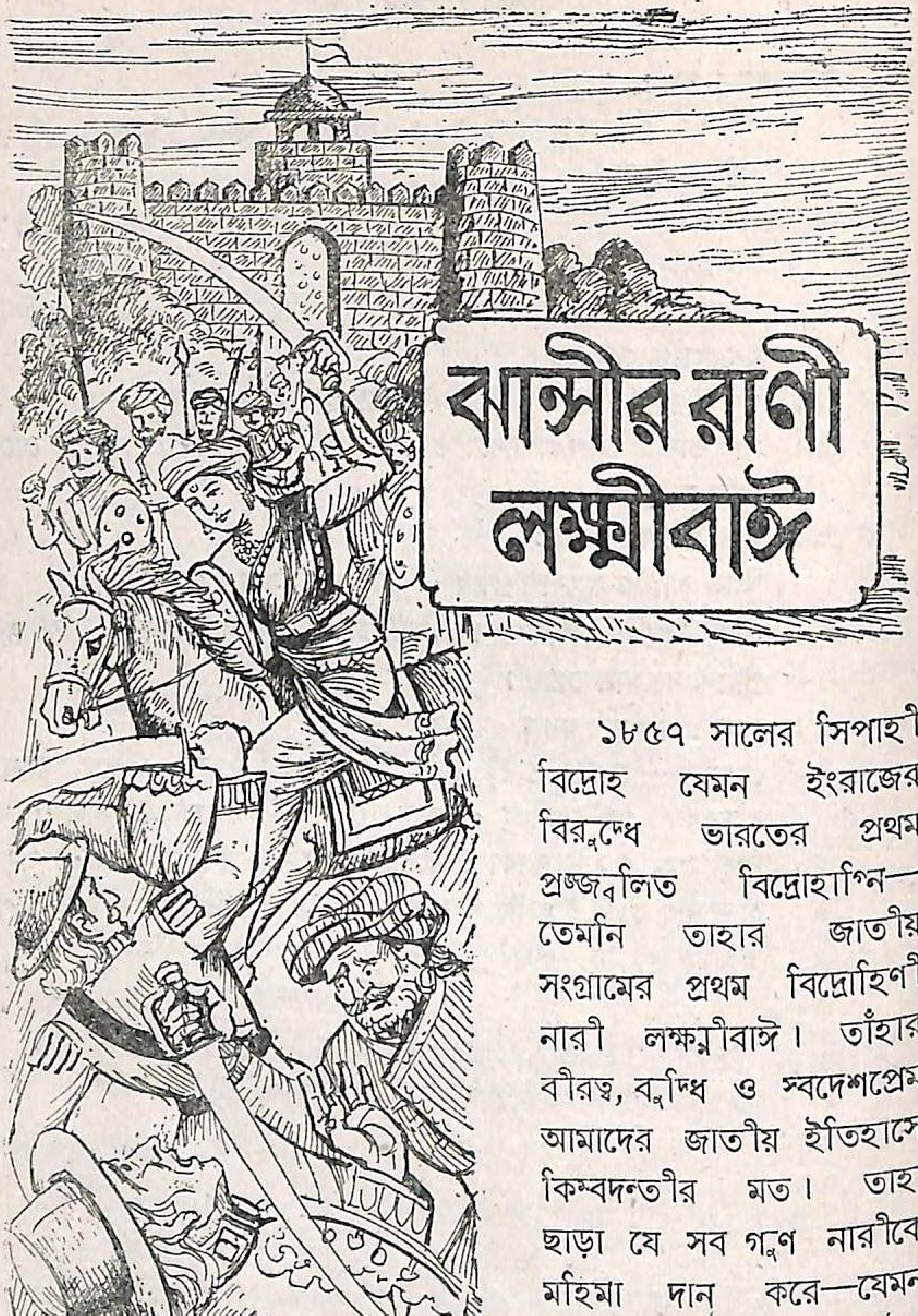
৫। উক্তি পরিবর্তন কর ঃ
'আজ আমিও সুযোগ পেয়ে ··· বেজায় গুলিয়ে যাচ্ছে।'

৭। টীকা লিখ ঃ গন্ধর্ব লোক, পাইলট, ইয়ারকান্দী, ইরানী, তুর্কিস্থানী, প্রয়াগ, বর্তমান ভারত।

৮। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ
যেখানে ··· ছোট ছোট ঢেউগুলি ··· সঙ্গে খেলা করছে, সেখানে দাঁড়াবেন পাট-বোঝাই ··· আর সেই ···। আর ঐ তাল ··· আঁব লিচুর রঙ, ঐ নীল আকাশ, মেঘের ··· ও সব আর কি আর ··· পাবে?

৯। এ রচনায় কয়টি ইংরাজি শব্দ আছে, খুঁজিয়া বাহির কর ও অর্থ লেখ।

ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ



১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ যেমন ইংরাজের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম প্রজ্জ্বলিত বিদ্রোহাগ্নি—তেমনি তাহার জাতীয় সংগ্রামের প্রথম বিদ্রোহিণী নারী লক্ষ্মীবাঈ। তাঁহার বীরত্ব, বুদ্ধি ও স্বদেশপ্রেম আমাদের জাতীয় ইতিহাসে কিম্বদন্তীর মত। তাহা ছাড়া যে সব গুণ নারীকে মহিমা দান করে—যেমন স্নেহ, করুণা ও সেবাধর্ম—সে সবই একত্রে মিলিয়া তাঁহাকে এক অসামান্যা নারী করিয়া তুলিয়াছে।

১৮৫৪ সালে তাঁহার স্বামী রাজা গঙ্গাধর রাও

হঠাৎ পরলোক গমন করিলেন। তাঁহাদের কোন সন্তান ছিল না। তাই রাণী দামোদর নামে এক শিশুকে 'দত্তক-পুত্র'রূপে গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে বসাইলেন। কিন্তু রাজ্যলোভী ইংরাজ রাণীর ব্যবস্থাকে অমান্য করিয়া ঝান্সীকে জোর করিয়া তাহাদের সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইল। স্বর্গীয় রাজার ব্যক্তিগত সম্পদ-সম্পত্তি সব অধিকার করিল। রাজ্য-রক্ষার জন্য যে সব সৈন্য-সামন্ত ছিল তাহাদের বরখাস্ত করিয়া দিল। ইহার উপর ইংরাজ সরকারের হুকুম হইল—এই লইয়াই রাণীকে রাজ্য-শাসন করিতে হইবে, তিনি মাত্র খাজনা আদায় করিবেন, পুলিসবাহিনী গঠন করিয়া রাজ্যের শৃঙ্খলা রক্ষা করিবেন।

বুদ্ধিমতী লক্ষ্মীবাঈ, প্রথম হইতেই শক্তিমান ইংরাজের বিরুদ্ধে হঠাৎ একটা যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বসিলেন না। তখনকার প্রতিকূল অবস্থায় তা সম্ভবও ছিল না। বরং তখন প্রস্তুতির জন্য রাণীর সর্ব-প্রধান প্রয়োজন ছিল—কিছুটা সময়। তাই দেখা যায়—প্রায় তিন বৎসর ধরিয়া তিনি ইংরাজের নিকট আবেদন-নিবেদনের বহু চিঠি-পত্র লিখিয়া কালহরণ করিতেছেন। এই তিন বৎসরের মধ্যে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করিলেন। যে সব সৈন্যকে ইংরেজরা বরখাস্ত করিয়াছিল, রাণী তাহাদের ডাকিয়া আনিয়া আবার বাহিনী গঠন করিলেন। তিনি নূতন এক নারীবাহিনীও গঠন করিলেন ; তাহাদের বন্দুক ছুঁড়িতে ও তরবারী চালনা করিতে শিখাইলেন এবং শুশ্রূষা-বিদ্যাও শিখাইলেন। এই সময়ে নূতন কতকগুলি কামানও তৈয়ারী করাইয়াছিলেন। তিনি নিঃসঙ্কোচে হিন্দু-মুসলমান সৈন্যদের সঙ্গে সমানভাবে মিশিতেন, বিপদের সময় পাশে দাঁড়াইয়া সাহায্য করিতেন এবং আহতদের অনেক সময় নিজের হাতে শুশ্রূষা করিতেন। এক দিকে এই মানবিকতা, অন্যদিকে দুর্দমনীয় সাহস ও অসাধারণ কর্মদক্ষতার দ্বারা তিনি প্রত্যেকটি সৈনিকের, প্রত্যেকটি নাগরিকের হৃদয় জয় করিতে পারিয়াছিলেন।

১৮৫৭ সালের শেষ দিকে মধ্যভারতের সর্বত্র বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল এবং ১৮৫৮ সালের জানুয়ারী মাসে রাণী লক্ষ্মীবাঈ খোলাখুলিভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। ঝান্সীর দুর্গচূড়ায় তাঁহার নাকাড়া ও চামর-চিহ্নিত সংগ্রামের লাল পতাকা উড়াইয়া দিলেন।

ইংরাজ সেনানী স্যার হিউরোজ ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের ২০শে মার্চ প্রাতঃকালে ঝান্সীর স্বজনবর্গসহ নিরস্ত্রভাবে রাণীকে ইংরেজের নিকট

সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিতে বলিলেন। কিন্তু তেজস্বিনী রাণী এরূপ হীনতা স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি একরাত্রির মধ্যে দুর্গ রক্ষার সমুদয় আয়োজন করিলেন।

২৩শে মার্চ হইতে ৩রা এপ্রিল পর্যন্ত ১১ দিন ইংরাজেরা ঝান্সী অবরোধ করিয়া রাণীর সৈন্যের সহিত অহোরাত্র যুদ্ধ করিলেন কিন্তু লক্ষ্মীবাঈয়ের অসাধারণ সাহস ও অধ্যবসায়গুণে তাঁহাদিগের দুর্গাধিকারের সকল চেষ্টাই বিফল হইল।

ঝান্সীর সৈনিকদিগের অসাধারণ বিক্রমে ইংরাজেরা পুনঃ পুনঃ বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এমন সময় দুলাজী ঠাকুর নামক রাণীর জনৈক বুন্দেলা সর্দার বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া দুর্গের দক্ষিণ দ্বার ইংরাজ সৈন্যকে ছাড়িয়া দিল। গোরা সৈন্য প্রবল সাগরপ্রবাহের ন্যায় সবেগে নগরে প্রবেশ করিয়া নিরীহ নগরবাসীদের যাহাকে সম্মুখে পাইল, বাল-বৃদ্ধ নির্বিশেষে তাহাকেই নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিতে লাগিল।

ইংরাজেরা ঝান্সীদুর্গ অধিকার করিলে রাণী লক্ষ্মীবাঈ আত্মরক্ষার জন্য পুরুষোচিত যোদ্ধৃবেশে অশ্বারোহণে নগর ত্যাগ করিলেন। রাজধানী পরিত্যাগকালে রাণী শিশু-পুত্র দামোদর রাওকে একখানি বহুমূল্য শালের দ্বারা স্বীয় পৃষ্ঠদেশে বন্ধন করিয়া লইয়াছিলেন। তদবধি সেই অষ্টমবর্ষীয় রাজকুমারকে প্রায় আড়াই মাস পর্যন্ত, প্রায় অধিকাংশ সময় জননীর পৃষ্ঠদেশেই অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল।

ঝান্সী ত্যাগের পর রাণী মহোদয়া কাল্পীতে গিয়া বিদ্রোহী সিপাহীদের সহিত মিলিত হইলেন। অতঃপর তিনি অসীম শৌর্য প্রকাশ করিয়া গোয়ালিয়র নগর ও দুর্গ অধিকার করিলেন। তাঁহার অসাধারণ শক্তিগুণে সমগ্র মধ্য ভারত ২।৩ মাস পর্যন্ত ইংরাজের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইংরাজরা গোয়ালিয়র উদ্ধার করিবার জন্য যে যুদ্ধ করেন, তাহাতেই এই বীর মহিলার অলোকসামান্য সমরনৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছিল।

শেষ পর্যন্ত ১৮ই জুনের ভয়াবহ যুদ্ধে তাঁহার সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়নপর হইলে, রানী স্বল্পসংখ্যক অনুচরসহ গোয়ালিয়র সমর ক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিলেন। কতিপয় ইংরাজ সৈনিক তাঁহার অনুসরণ করিল। আত্মরক্ষার আশা বিলীনপ্রায় হওয়ায় রাণী রামচন্দ্র রাও দেশমুখ নামক একজন বিশ্বস্ত সর্দারের প্রতি স্বীয় প্রিয়তম

পুত্রের রক্ষণভার অর্পণ করিয়াছিলেন। কিয়দ্দূর গমনের পর তিনি ইংরাজ সৈনিকদের দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। তখন উভয় পক্ষে যে যুদ্ধ বাধিল, তাহাতে একজন শ্বেতাঙ্গ সৈনিক লক্ষ্মীবাঈয়ের শীর্ষদেশে অস্ত্রাঘাত ও বক্ষে সঙ্গীন বিদ্ধ করিল। সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়াও বীর রমণী অতুল বিক্রমে আততায়ীর প্রাণবধ করিলেন। শত্রুপক্ষীয় সৈনিকের ভীষণ খড়্গাঘাতে কাতর অবস্থায় রামচন্দ্র রাও তাঁহাকে নিকটবর্তী এক পর্ণকুটীরে লইয়া গেলেন। তখন পিপাসায় রাণীর কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছিল। কুটীরস্বামী গঙ্গাদাস বাবাজী তাঁহাকে গঙ্গাজল পান করাইলেন। সুশীতল গঙ্গোদকপানে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া রাণী স্নেহপূর্ণ নয়নে দামোদরের প্রতি একবার সকরুণ দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিতে দেখিতে তাহার নেত্রদ্বয় চিরকালের জন্য দীপ্তিহীন হইল।

[সখারাম গণেশ দেউস্কর ও ডঃ প্রমোদ সেনগুপ্ত হইতে সংকলিত]

অনুশীলনী

পাঠ-সংকেত ঃ সিপাহী বিদ্রোহের অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্মীবাঈর সংগ্রাম কাহিনী। এই সিপাহী বিদ্রোহ ইংরেজের বিরুদ্ধে আমাদের প্রথম জাতীয় সংগ্রাম। তাই, রাণী লক্ষ্মীবাঈকে গণ্য করিতে হয় আমাদের জাতীয় সংগ্রামের প্রথম নারী যোদ্ধা হিসাবে। এই মহীয়সী নারী ছিলেন সাহসে দুর্জয়, রানী হিসাবে প্রজাসাধারণের একান্ত প্রিয়, কৌশলী ও রণনিপুণা। সর্বাপেক্ষা লক্ষ্যণীয় —এই দুর্জয় দুঃসাহসী চরিত্রের সঙ্গে মিশিয়াছিল নারীত্বের অপূর্ব এক কোমলতা। বস্তুতঃ, ভারতীয় নারীর এ এক অবিস্মরণীয় আদর্শ চরিত্র।

[ক] **মৌখিক প্রশ্ন ঃ**

১। এই নিবন্ধের রচয়িতার নাম কর। সখারাম গণেশ দেউস্কর কোন্ প্রদেশীয়? তাঁহার খ্যাতি কেন?
২। সিপাহী বিদ্রোহ কত সালে ঘটে?
৩। রানীর দত্তকপুত্রের নাম কি? দত্তকপুত্র মানে কি?
৪। কত সালে রানী ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন?
৫। রানীর বিশ্বাসঘাতক সর্দারের নাম কি?
৬। যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিয়োজিত থাকার সময় রানীর দত্তকপুত্র কাহার তত্ত্বাবধানে থাকিত?
৭। রানীর সংগ্রামের পতাকা কিরূপ ছিল?

[খ] **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :**

১। 'কিন্তু রাজ্যলোভী ইংরাজ ··· সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইল।' এই সাম্রাজ্যভুক্তির পর ইংরাজ কর্তৃপক্ষ কি কি ব্যবস্থা লইয়াছিল ?

২। 'বরং তখন প্রস্তুতির জন্য ··· কিছুটা সময়।'—কিসের প্রস্তুতি ? সেই প্রস্তুতি রানী কিভাবে করিলেন ? প্রস্তুতি ছাড়া তিন বৎসরের সময়ে আর কি কৌশল গ্রহণ করেন ?

৩। কিন্তু তেজস্বিনী ··· সম্মত হইলেন না।' কোন্ প্রসঙ্গে এ কথা বলা হইয়াছে ? কিরূপ হীনতা ? রানীর তেজস্বিতার পরিচয় দাও।

৪। ঝান্সী দুর্গের অবরোধ কাহারা করিয়াছিল ? রানী কতদিন যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন ? কে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া দুর্গের দ্বার দেখাইয়া দিয়াছিল ?

৫। 'কতিপয় ইংরাজ সৈনিক ··· অনুসরণ করিল।' কাহাকে অনুসরণ করিল ? কখন অনুসরণ করিল ? পরিণাম কি হইল ?

[গ] **রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :**

১। কিভাবে ইংরেজ সৈন্য ঝান্সী দুর্গে প্রবেশ করিয়াছিল এবং তাহারা কিরূপ আচরণ করিয়াছিল, নিজের ভাষায় লেখ।

২। রানী কিভাবে নগরত্যাগ করিয়াছিলেন—তাহা লেখ।

৩। মধ্য ভারত কাহার নৈপুণ্যে, কতদিন পর্যন্ত ইংরাজের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল ?

৪। রানী কিভাবে নিহত হইলেন ? তাঁহার অন্তিম জীবনকালের কাহিনী বিবৃত কর।

৫। রানীর কঠোর ও কোমল চরিত্রের একটি সংক্ষিপ্ত আলেখ্য রচনা কর।

[ঘ] **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :**

১। 'বরং তখন প্রস্তুতির জন্য ··· কিছুটা সময়।' প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর।

২। 'ঝাঁসীর সৈনিকদিগের ··· পড়িতে লাগিলেন।' প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা লেখ।

[ঙ] **ব্যাকরণগত প্রশ্ন :**

১। টীকা রচনা কর : গঙ্গাধর রাও, হিউরোজ, কাড়ানাকাড়া ও চামর, গঙ্গাদাস বাবাজী, দুলাজী ঠাকুর, রামচন্দ্র রাও দেশমুখ, ঝান্সী, গোয়ালিয়র দুর্গ।

২। শূন্যস্থান পূর্ণ কর: কিন্তু — ইংরাজ রাণীর ব্যবস্থাকে — করিয়া — জোর করিয়া তাহাদের — করিয়া লইল। স্বর্গীয় রাজার — সম্পদ সম্পত্তি সব — করিয়া লইল।

৩। ভুল থাকলে সংশোধন কর: ১৮৭৫ সালের শেষের দিকে ভারতের সর্বত্র বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল এবং ১৮৮৬ সালের এক মাসে রানী লক্ষ্মীবাঈ গোপনে বিদ্রোহ দমন করিলেন।

৪। সমাস নির্ণয় কর: বিদ্রোহাগ্নি, সেবাধর্ম, সাম্রাজ্যভুক্ত, কালহরণ, অসাধারণ, বিশ্বাসঘাতক, অহোরাত্র।

৫। বিপরীত শব্দার্থসহ বাক্য রচনা কর: বিরুদ্ধে, অসামান্যা, দত্তকপুত্র, অধিকার, বরখাস্ত, নিঃসঙ্কোচে, নির্বিশেষে, আত্মরক্ষা।

৬। দ্বিতীয় সারির বাক্যাংশ লইয়া প্রথম সারির বাক্য পাঠ-অনুসারে সম্পূর্ণ কর:

এই তিন বৎসরের মধ্যে তিনি ··· তরবারি চালনা করিতে শিখাইলেন।

তাহাদের বন্দুক ছুঁড়িতে ও ··· হৃদয় জয় করিতে পারিয়াছিলেন।

তিনি নূতন এক ··· ··· নিজেকে প্রস্তুত করিলেন।

প্রত্যেকটি নাগরিকের ··· নারী বাহিনীও গঠন করিলেন।

৭। শূন্যস্থান পূরণ কর:

ইংরাজ সেনানী স্যার — ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ — ঝান্সীর স্বজনবর্গসহ — রানীকে ইংরাজের নিকট সম্পূর্ণ—করিতে বলিলেন। কিন্তু — রানী এরূপ হীনতা স্বীকার করিতে — হইলেন না।

৮। চলিত ভাষায় লেখ:

তখন উভয় পক্ষে যে যুদ্ধ বাধিল, তাহাতে জনৈক শ্বেতাঙ্গ সৈনিক লক্ষ্মীবাঈয়ের শীর্ষদেশে অস্ত্রাঘাত ও বক্ষে সঙ্গীন বিদ্ধ করিল। সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়াও বীর রমণী অতুল বিক্রমে আততায়ীর প্রাণবধ করিলেন।



ইন্দ্রনাথ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অনুকূল স্রোতে এবং বোঠের তাড়নায় ডিঙিখানা তর্ তর্ করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল। আরও কিছুদূর আসিতেই দক্ষিণের আগ্রীবমগ্ন বনঝাউ এবং কসাড় বন মাথা তুলিয়া এই দুটি অসমসাহসী মানব-শিশুর পানে বিস্ময়-স্তব্ধভাবে চাহিয়া রহিল এবং কেহবা মাঝে মাঝে শিরশ্চালনে কি যেন নিষেধ জানাইতে লাগিল। বামদিকেও তাহাদেরই আত্মীয় পরিজনেরা সু-উচ্চ কাঁকরের পাড় সমাচ্ছন্ন করিয়া তেম্‌নি করিয়াই চাহিয়া রহিল এবং তেম্‌নি করিয়া মানা

করিতে লাগিল। আমি একা হইলে নিশ্চয়ই তাহাদের সঙ্কেত অমান্য করিতাম না। কিন্তু কর্ণধার যিনি, তাঁহার কাছে বোধকরি 'রাম-নামের' জোরে ইহাদের সমস্ত আবেদন নিবেদন একেবারেই ব্যর্থ হইয়া গেল। সে কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ করিল না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, ডিঙি বেঁধে উপরে উঠবার তো কোন ঘাট নেই, তুমি যাবে কি ক'রে?

ইন্দ্র কহিল, ঐ যে বটগাছ; ওর পাশেতেই একটা সরু ঘাট আছে।

কিছুক্ষণ হইতে কেমন একটা দুর্গন্ধি মাঝে মাঝে হাওয়ার সঙ্গে নাকে আসিয়া লাগিতেছিল। যত অগ্রসর হইতেছিলাম, ততই সেটা বাড়িতেছিল। এখন হঠাৎ একটা দম্‌কা বাতাসের সঙ্গে সেই গন্ধটা এমন বিকট হইয়া নাকে লাগিল যে অসহ্যবোধ হইল। নাকে কাপড় চাপা দিয়া বলিলাম, নিশ্চয়ই কি পচেছে, ইন্দ্র।

ইন্দ্র বলিল, মড়া। আজকাল ভয়ানক কলেরা হচ্ছে কিনা? সবাই তো পোড়াতে পারে না—মুখে একটু আগুন ছুঁইয়ে ফেলে দিয়ে যায়। শেয়াল কুকুরে খায় আর পচে। তারই অত গন্ধ।

—কোন্‌খানে ফেলে দিয়ে যায় ভাই?

—ঐ হোথা থেকে হেথা পর্যন্ত—সবটাই শ্মশান কিনা। যখন হোক্‌ ফেলে রেখে ঐ বটতলার ঘাটে চান করে বাড়ি চ'লে যায়—আরে দূর! ভয় কিরে! ও শিয়ালে শিয়ালে লড়াই কর্‌চে। আচ্ছা, আয় আয়, আমার কাছে এসে বোস্‌।

আমার গলা দিয়া স্বর ফুটিলনা—কোনমতে হামাগুড়ি দিয়া তাহার কোলের কাছে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। সে ক্ষণকালের জন্য আমাকে একবার স্পর্শ করিয়া হাসিয়া কহিল, ভয় কি শ্রীকান্ত? কত রাত্তিরে একা আমি এই পথে যাই আসি—তিনবার রাম নাম করলে কার সাধ্যি কাছে আসে?

তাহাকে স্পর্শ করিয়া দেহটাতে যেন একটু সাড়া পাইলাম—অস্ফুটে কহিলাম, না ভাই, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, কোথাও নেবো না—সোজা বেরিয়ে চল।

সে আবার আমার কাঁধে হাত ঠেকাইয়া বলিল, না শ্রীকান্ত, একটিবার যেতেই হবে। এই টাকা ক'টি না দিলেই নয়—তারা পথ চেয়ে বসে আছে—আমি তিনদিন আসতে পারিনি।

গাছের ছায়ার মধ্যে আসিয়া পড়ায়, অদূরেই সেই ঘাটটি চোখে পড়িল। সেখানে আমাদের অবতরণ করিতে হইবে, তাহার উপরে যে

গাছপালা নাই, স্থানটি ম্লান জ্যোৎস্নালোকেও বেশ আলোকিত হইয়া আছে, দেখিয়া অত দুঃখেও একটু আরাম বোধ করিলাম। ঘাটের কাঁকরে ডিঙি ধাক্কা না খায়, এই জন্য ইন্দ্র পূর্বাহ্নেই প্রস্তুত হইয়া মুখের কাছে সরিয়া আসিল এবং লাগিতে না লাগিতে লাফাইয়া পড়িয়াই একটা ভয় জড়িত স্বরে 'ইস্' করিয়া উঠিল। আমিও তাহার পশ্চাতে ছিলাম, সুতরাং উভয়েই প্রায় এক সময়েই সেই বস্তুটির উপর দৃষ্টিপাত করিলাম।

অকাল-মৃত্যু বোধ করি আর কখনও তেমন করুণভাবে আমার চোখে পড়ে নাই।

গভীর নিশীথে চারিদিক নিবিড় স্তব্ধতায় পরিপূর্ণ। শুধু মাঝে মাঝে ঝোপ-ঝাড়ের অন্তরালে শ্মশানচারী শৃগালের ক্ষুধার্ত কলহ চীৎকার, কখন বা বৃক্ষোপবিষ্ট অর্ধসুপ্ত বৃহৎকায় পক্ষীর পক্ষতাড়ন শব্দ, আর বহুদূরাগত তীব্র জলপ্রবাহের অবিশ্রাম হু-হু-হু আর্তনাদ —ইহার মধ্যে দাঁড়াইয়া উভয়েই নির্বাক, নিস্তব্ধ হইয়া, এই মহাকরুণ দৃশ্যটির পানে চাহিয়া রহিলাম। একটি গৌরবর্ণ ছয় সাত বৎসরের হৃষ্টপুষ্ট বালক—তাহার সর্বাঙ্গ জলে ভাসিতেছে, শুধু মাথাটি ঘাটের উপরে। শৃগালেরা বোধকরি জল হইতে এই মাত্র তাহাকে তুলেতেছিল, শুধু আমাদের আকস্মিক আগমনে নিকটে কোথাও গিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে! খুব সম্ভব তিন চারি ঘণ্টার অধিক তাহার মৃত্যু হয় নাই! ঠিক যেন বিসূচিকার যন্ত্রণা ভোগ করিয়া সে বেচারা মা গঙ্গার কোলের উপরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

মুখ তুলিয়া দেখি, ইন্দ্রের দুই চোখ বাহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতেছে। সে কহিল, তুই একটু সরে দাঁড়া শ্রীকান্ত, আমি এ-বেচারাকে ডিঙিতে তুলে ঐ চড়ার ঝাউবনের মধ্যে জলে রেখে আসি।

চোখের জল দেখিবামাত্র আমার চোখেও জল আসিতেছিল সত্য; কিন্তু ছোঁয়া-ছুঁয়ির প্রস্তাবে আমি একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম।

এ কোন্ রোগের মড়া, কাহার ছেলে, কি জাত—কিছুই না জানিয়া এবং মরিবার পর এ ছোক্‌রা ঠিকমত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল কিনা, সে খবরটা পর্যন্ত না লইয়াই বা ইহাকে স্পর্শ করা যায় কিরূপে?

কুণ্ঠিত হইয়া যেই জিজ্ঞাসা করিলাম, কি জাতের মড়া—তুমি ছোঁবে? ইন্দ্র সরিয়া আসিয়া একহাত তাহার ঘাড়ের তলায় এবং অন্যহাত হাঁটুর নীচে দিয়া, একটা শুষ্ক তৃণখণ্ডের মত স্বচ্ছন্দে তাহাকে তুলিয়া লইয়া

কহিল, নইলে বেচারাকে শিয়ালে ছেঁড়া-ছিঁড়ি করে খাবে। আহা! মুখে এখনো এর ওষুধের গন্ধ পর্যন্ত রয়েচে রে। বলিয়া নৌকার যে তক্তাখানির উপরে ইতিপূর্বে আমি শুইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহার উপর শোয়াইয়া নৌকা ঠেলিয়া নিজেও চড়িয়া বসিল! কহিল, মড়ার কি জাত থাকে রে?

আমি তর্ক করিলাম, কেন থাকবে না?

ইন্দ্র কহিল, আরে এ যে মড়া। মড়ার আবার জাত কি? ঐ যেমন আমাদের ডিঙিটা—এর কি জাত আছে? আম গাছ, জাম গাছ যে কাঠেরই তৈরী হোক্—এখন ডিঙি ছাড়া একে কেউ বলবে না—আম গাছ, জাম গাছ—বুঝলি না? এও তেমনি।

চড়ার উপর আসিয়া অর্ধমগ্ন বন-ঝাউয়ের অন্ধকারের মধ্যে জলের উপরে সেই অপরিচিত শিশুদেহটিকে ইন্দ্র যখন অপূর্ব মমতার সহিত রাখিয়া দিল, তখন রাত্রি আর বড় বাকি নাই।

আমি বলিলাম, ইন্দ্র এইবার চল।

ইন্দ্র অন্যমনস্কভাবে কহিল, কোথায়?

—এই যে বল্লে, কোথায় যাবে?

—থাক—আজ আর না।

আমি খুসী হইয়া কহিলাম, বেশ, তাই ভাল ভাই—চল বাড়ি যাই।

প্রত্যুত্তরে ইন্দ্র আমার মুখে পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, হাঁ রে শ্রীকান্ত, মরলে মানুষ কি হয় তুই জানিস?

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, না ভাই জানিনে, তুমি বাড়ি চল। তারা সব স্বর্গে যায় ভাই! তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে বাড়ি রেখে এসো।

ইন্দ্র যেন কর্ণপাতই করিল না। কহিল, সবাই ত স্বর্গে যেতে পায় না। তাছাড়া খানিকক্ষণ সবাইকেই এখানে থাকতে হয়। দ্যাখ্ আমি যখন ওকে জলের উপর শুইয়ে দিচ্ছিলুম, তখন সে চুপি চুপি স্পষ্ট বললে, ভেইয়া।

আমি কম্পিতকন্ঠে কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিয়া উঠিলাম, কেন ভয় দেখাচ্ছ ভাই, আমি অজ্ঞান হয়ে যাবো।

ইন্দ্র কথা কহিল না, ধীরে ধীরে বোঠে হাতে করিয়া নৌকা ঝাউবন হইতে বাহির করিয়া ফেলিল এবং সোজা বাহিতে লাগিল। মিনিট-দুই নিঃশব্দে থাকিয়া গম্ভীর মৃদুস্বরে কহিল, শ্রীকান্ত মনে মনে রামনাম কর, সে নৌকা ছেড়ে যায়নি—আমার পেছনেই ব'সে আছে।

তারপর সেইখানেই মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়াছিলাম। আর মনে নাই। যখন চোখ খুলিলাম তখন অন্ধকার নাই—নৌকা কিনারায় লাগানো। ইন্দ্র আমার পায়ের কাছে বসিয়াছিল; কহিল, এইটুকু হেঁটে যেতে হবে শ্রীকান্ত, উঠে ব'স্।

অনুশীলনী

পাঠ-সংকেত : এই অংশটি শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস 'শ্রীকান্ত'র ১ম পর্বভুক্ত। কোনও দুর্গম অভিযানে যেমন অপরিচয়ের ভীতিমিশ্রিত আনন্দ, বিস্ময়, রোমাঞ্চ, অবসাদ ইত্যাদি লক্ষণগুলি দেখা যায়—ইহার মধ্যে তাহার কোনটিরই অভাব নাই। উপরন্তু এই অভিযানের মধ্য দিয়া দুটি বিপরীত চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে—শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ। প্রথমটি নানা সংস্কার ও ভয়ের বশীভূত, অন্যটি সংস্কার ও ভয় ভাঙার; অনবদ্য এই ইন্দ্রনাথ চরিত্র। দয়ামায়া, শক্তি, সাহস ও সহৃদয়তায় বাংলা সাহিত্যে এ এক অতুলনীয় সৃষ্টি।

[ক] মৌখিক প্রশ্ন :

১। গল্পাংশটি কাহার রচিত? কোন্ উপন্যাসের? লেখকের খ্যাতির কারণ কি?

২। বিসূচিকা কোন্ রোগ?

৩। প্রায়শ্চিত্ত কি বস্তু? উহার কি প্রয়োজন?

[খ] সংক্ষিপ্ত উত্তরীভিত্তিক প্রশ্ন :

১। 'আমি একা হইলে……করিতাম না।'—বক্তা কে? সঙ্গে আর কে ছিল? কোন্ প্রসঙ্গে একথা বলা হইয়াছে? কিসের সংকেত—তাহার অর্থ কি? এই মন্তব্যে বক্তার কোন্ চরিত্র প্রকাশ পাইতেছে?

২। 'আচ্ছা, আয় আয়, আমার কাছে এসে বোস্।'—বক্তা কে? কোন্ প্রসঙ্গে এ কথা? এই কথায় বক্তার কোন্ চরিত্রগুণ প্রকাশ পাইয়াছে?

৩। 'চোখের জল দেখিবামাত্র……সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম।'—বক্তা কে? কোন্ প্রসঙ্গে, কাহার চোখে সে জল দেখিল? ইহার দ্বারা তাহার কিরূপ চরিত্র অনুমান কর? ছোঁয়া-ছুঁইর প্রস্তাবে বক্তারই বা কিরূপ চরিত্র উপলব্ধি কর? এই দুই চরিত্রের কোন পার্থক্য আছে কি?

[গ] রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :

১। 'এই দুটি অসমসাহসী……জানাইতে লাগিল।'—কাহারা বিস্ময়স্তব্ধ ভাবে চাহিয়াছিল—নিষেধই বা কিসের? ইহার পূর্বের ও পরের কয়েকটি ছত্রে প্রকৃতির যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা নিজের ভাষায় লেখ।

২। মৃত বালকের পরিত্যক্ত দেহটির সৎকারে ইন্দ্রনাথের যে চরিত্র রচিত হইয়াছে, নিজের ভাষায় তাহা বুঝাইয়া দাও।

৩। মড়া ও কাঠের যে যুক্তি ইন্দ্রনাথ দিয়াছিল—সে সম্বন্ধে তোমার ধারণা সংক্ষেপে প্রকাশ কর।

[ঘ] **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ**

১। 'বামদিকে তাহাদেরই … মানা করিতে লাগিল।'—প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর।

২। 'ইহার মধ্যে দাঁড়াইয়া উভয়েই … চাহিয়া রহিলাম।'—প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর।

৩। 'এখন ডিঙি ছাড়া একে কেউ বলবে না—আম গাছ, জাম গাছ—বুঝলি না? এও তেমনি।' প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর।

[ঙ] **ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ**

১। শব্দার্থসহ বাক্যরচনা কর ঃ আগ্রীবমগ্ন, সমাচ্ছন্ন, বহুদূরাগত, বিসূচিকা।

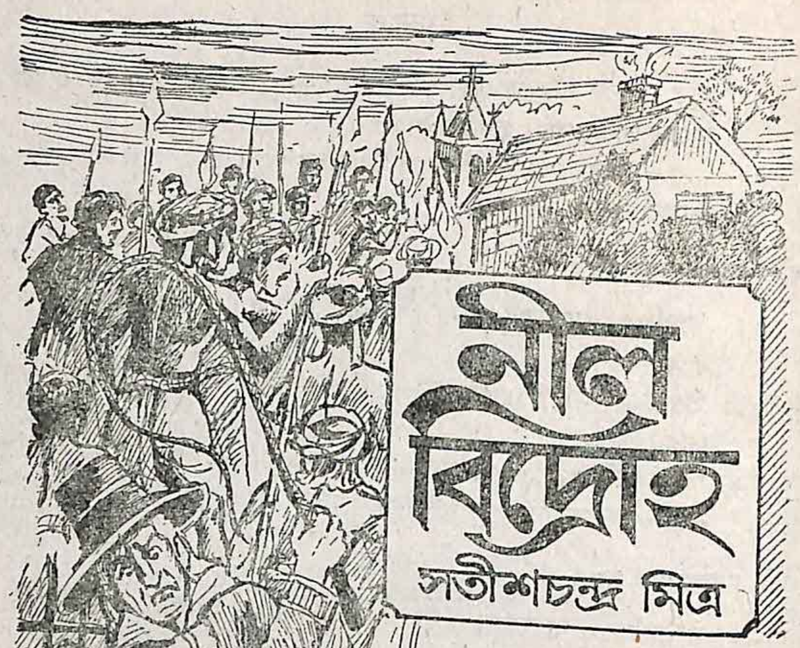
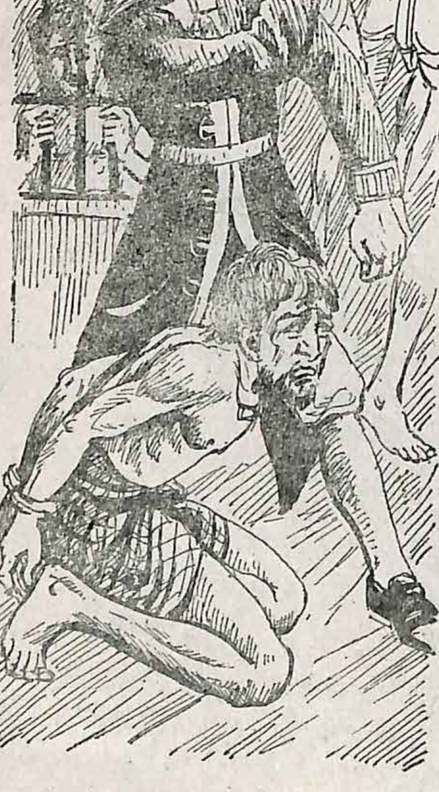
২। সমাস নির্ধারণ কর ঃ ভয়জড়িত, শ্মশানচারী, অর্ধসুপ্ত, হৃষ্টপুষ্ট, আগ্রীবমগ্ন, পূর্বাহ্নে, অস্ফুট, বৃক্ষোপবিষ্ট, পক্ষতাড়ন।

৩। কারক বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ শিরশ্চালনে, দেহটাতে, কিনারার, অস্ফুটে, স্তব্ধতায়।

৪। বাচ্য পরিবর্তন কর ঃ 'কহিল, সবাই ত …… ভেইয়া।'

৫। চলিত ভাষায় পরিবর্তিত কর ঃ

গভীর নিশীথে চারিদিকে …… চাহিয়া রহিলাম।'

নীল বিদ্রোহ

সতীশচন্দ্র মিত্র

অতি-প্রাচীনকাল হইতে নীল রঙের কথা ভারতবাসীদের জানা ছিল এবং তাঁহারা উহা প্রস্তুত করিতে জানিতেন। প্লিনি প্রভৃতি প্রাচীন রোমক পণ্ডিতগণ 'ইণ্ডিকাম' বলিয়া উহার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজি ইণ্ডিগো (indigo) কথা, বা যে গাছ হইতে নীল হয়, সেই গাছের নামের সঙ্গে ইন্দ বা হিন্দুস্থানের সম্বন্ধ চিরগ্রথিত রহিয়াছে। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'-তে দেখিতে পাই, গুজরাটের অন্তর্গত আহমদাবাদে

এবং আগ্রার নিকটবর্তী বায়নাতে উৎকৃষ্ট নীল রঙ প্রস্তুত হইয়া কনস্টাণ্টিনোপলে যাইত।

ইংরাজ আমলের প্রথমভাগে আমেরিকা হইতে নীল উৎপাদনের নূতন প্রণালী এদেশে আসে এবং উহার প্রবর্তক হইয়াছিলেন একজন ফরাসী বণিক লুই বোনড্। তিনি ১৭৭৭ অব্দে বঙ্গদেশে আসিয়া চন্দননগরের নিকটবর্তী তালডাঙ্গা ও গোঁদলপাড়ায় দুইটি নীল কুঠি খুলেন। উহার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে। তিনিই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বপ্রথম ইওরোপীয় নীলকর।

১৮১১ অব্দ নাগাদ যশোহর ও ঢাকা জেলা নীলকুঠিতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। নীলকরগণ সর্বত্র নীলকুঠি স্থাপন করিতে লাগিলেন। বিলাতে ও বিদেশের সকল বিপণিতে বঙ্গীয় নীলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ নদীয়া ও যশোহর জেলার নীল জগতের মধ্যে অতুলনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

সেই নীলের খ্যাতি বিলাতে পৌঁছিলে, বহু ধনীর পুত্র এই ব্যবসায়ে বড় লোক হইবার আশায় এদেশে আসিতে লাগিলেন। প্রথম আমলে অধিকাংশ নীলকর সাহেবই নিজের মঙ্গল বুঝিতেন, প্রজার সহিত সম্প্রীতি ব্যতীত যে ব্যবসায়ের উন্নতি নাই, তাহা বুঝিয়া প্রজার মঙ্গলের দিকে চাহিতেন। কিন্তু ব্যবসায়ের অতিরিক্ত লোভে তাঁহাদের মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়াছিল। তাঁহারা রাজার হালে বাস করিতেন। নিজেকে রাজার জাতি মনে করিয়া প্রজাকে ঘৃণা করিতেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে নীলকরের সঙ্গে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, কুঠিয়াল সাহেব বিচারকের পার্শ্বের চেয়ার পাইতেন, দেশীয় জমিদার বা প্রজা কাঠগড়ায় খাড়া থাকিতেন। বিচারক কুঠিয়ালের সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতেন এবং অফিসান্তে কুঠিতে কুঠিতে নিমন্ত্রণের আদান প্রদান হইত। সুতরাং বিজিত দেশের জমিদার বা রাইয়ত উভয়ই নিজ অবস্থা বুঝিতেন; জমিদার তাই নিজের তালুক মুলুক নীলকরকে ইজারা পত্তনী দিয়া সম্ভ্রম রক্ষা করিতেন, রাইয়তেরা লোকসানের সম্ভাবনা জানিয়াও নীলের দাদন লইতেন। গর্বস্ফীত নীলকরেরা অত্যাচারী হইয়া দাঁড়াইলেন।

নীলের চাষে লাভ নাই, তাহা প্রজারা বুঝিতেন। তাঁহারা নীল চাষ না করিয়া কাটাইবার চেষ্টা করিতেন। কুঠিয়াল সাহেবেরা নানা ভাবে ভয় দেখাইয়া মারিয়া ধরিয়া অত্যাচার করিয়া তাহাদিগকে নীল বুননে বাধ্য করিতেন। এবং সাদা কাগজে একরার-নামা লেখাইয়া লইতেন।

অত্যাচার যে কত প্রকারের ছিল তা বলিবার নহে। প্রজাকে জোর করিয়া দাদন দেওয়া হইত; পলায়িত প্রজার ঘর ভাঙিয়া ভিটার উপর নীলের চাষ করা হইত, এমন কি ঘর জ্বালাইয়া দিয়া উৎপাত করিয়া অবাধ্য রাইয়তকে তাড়াইয়া দেওয়া হইত। কুঠিতে-কুঠিতে কয়েদ-ঘর ছিল; চুক্তি ভঙ্গ করিলে রাইয়তদিগকে কুঠিতে ধরিয়া লইয়া নানা নবোদ্ভাবিত কৌশলে পীড়ন করিবার পর কয়েদ করিয়া রাখা হইত। প্রহার করিবার জন্য এক প্রকার নূতন লগুড় তৈয়ার করা হইয়াছিল, তাহার নাম 'রামকান্ত' বা 'শ্যামচাঁদ'। নীল বুনিতে না চাহিলে ক্রোধান্ধ কুঠিয়ালেরা গুলি করিয়া খুন করিত, গ্রামকে গ্রাম উজাড় উৎসন্ন করিয়া দিত।

এই সব অত্যাচারের ফলে অবশেষে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। প্রজাকুল দলবদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন, 'প্রাণ থাকিতে তাহারা আর নীল বপন করিবে না।' ১৮৫৮ অব্দে দেশময় নীলবিদ্রোহ দেখা দিল। এই বিদ্রোহ স্থানিক বা সাময়িক নহে; যেখানে যতকাল ধরিয়া বিদ্রোহের কারণ বর্তমান ছিল, সেখানে ততকাল ধরিয়া গোলমাল চলিয়াছিল। উহার নিমিত্ত যে কত গ্রাম্যবীর ও নেতার উদয় হইয়াছিল, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁহাদের নাম নাই। লড়াই তো অনেক হইয়াছিল, আজ কয় জনে তাহার খবর রাখে? কত লোক কত স্থানে হত বা আহত হইয়াছিল, তাহার খবর নাই। খবর এইটুকু আছে, তাঁহাদের যন্ত্রণা ও মৃত্যু সফল হইয়াছিল, জেদ বজায় ছিল। তাঁহারা হাসির সঙ্গে কারাবরণ করিতেন, ভগবানের নাম করিয়া সকল দুঃখ নীরবে সহ্য করিতেন।

যাঁহারা কার্যক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিয়া লেখনীর সাহায্যে প্রজাবর্গের বন্ধু হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে 'নীলদর্পণ' প্রণেতা দীনবন্ধু মিত্র এবং কলিকাতার 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে।

হরিশ্চন্দ্র সামান্য বেতনের সরকারী কর্মচারী মাত্র ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কলমের মুখে জ্বলন্ত ভাষা উদ্‌গীরিত হইত এবং বিপ্লবের যুগে তিনি বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি শুধু সম্পাদকতা করিতেন না, তাঁহার গৃহ-প্রাঙ্গণ নিত্য অসংখ্য নীলকর-পীড়িত রাইয়তের অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইত। তিনি উহাদিগকে আশ্রয় দিতেন, অন্ন দান করিতেন। অনিয়মিত গুরু পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িল, তিনি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

১৮৬০ অব্দে 'নীলদর্পণ' নাটক ঢাকা' হইতে প্রকাশিত হয়। দীনবন্ধুর তুলিকাপাতে নীলকর-পীড়িত বাংলাদেশের এক জীবন্ত চিত্র প্রকটিত হইল। কয়েকমাস মধ্যে যখন এই পুস্তক পাদ্রী লঙ সাহেবের তত্ত্বাবধানে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের নিপুণ লেখনীর সাহায্যে ইংরাজীতে ভাষান্তরিত হইল, তখন নীলকর মহলে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। ক্ষিপ্ত নীলকর সম্প্রদায় লঙ সাহেবের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনিয়াছিলেন ; বিচারে লঙ-এর এক মাস কারাদণ্ড ও সহস্র টাকা অর্থদণ্ড হইল। জরিমানার টাকা স্বনামধন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ তৎক্ষণাৎ কোর্টে দাখিল করিলেন। পথে ঘাটে শস্যক্ষেতে মর্মব্যথিত কৃষকের কণ্ঠে তখন স্বভাব কবির গ্রাম্যসুরে গান শুনা গিয়াছিল ঃ

নীল-বাঁদরে সোনার বাঙ্গালা করলে এবার ছারেখার !
অসময়ে হরিশ ম'লো, লং-এর হল কারাগার
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার।

১৮৯৫ অব্দের কিছু পরে জার্মানী হইতে কৃত্রিম কৌশলে প্রস্তুত সস্তা নীল প্রচুর পরিমাণে দেশে দেশে আমদানী হওয়ায়, স্বভাবজাত দুর্মূল্য নীলের ব্যবসায় একেবারে উঠিয়া গেল।

অনুশীলনী

পাঠ-সংকেত ঃ লেখক স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিক ; তিনি যশোহর খুলনার মূল্যবান ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই সুবাদে তাঁহার নীল সম্পর্কিত ইতিবৃত্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই রচনাংশে, কি ভাবে নীলকর সাহেবেরা এদেশে ব্যবসা ফাঁদিল, অতিলাভের লোভে ক্রমে তাহারা কিরূপ দৌরাত্ম্য সুরু করিল এবং নীল চাষীরাই বা কিরূপ প্রতিরোধ ও সংগ্রাম করিয়াছিল, তাহারই কিছু অংশ এখানে বিবৃত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে, সেদিন শিক্ষিত ভদ্রলোকেরাও যে পিছাইয়া ছিলেন না —তাহাও আলোচনাযোগ্য।

[ক] **মৌখিক প্রশ্ন ঃ**

১। এই রচনাংশের শিরোনাম কি ? কে ইহার রচয়িতা ? কি তাঁহার পরিচয় ?
২। লুই বোনড্ কে ছিলেন ?
৩। তালডাঙা ও গোঁদলপাড়া কোথায় ?
৪। নদীয়া যশোহর বর্তমান কোন্ প্রদেশের অন্তর্গত ?
৫। কত সালে কৃত্রিম নীল আমদানী হইল ?

[খ] **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

১। 'গর্বস্ফীত নীলকরেরা অত্যাচারী হইয়া দাঁড়াইলেন ;'—ইহারা কাহারা, কোন্ জাতীয় ? কিভাবে, কেন গর্বস্ফীত হইলেন ; প্রথম স্তরে ইহারা কিরূপ ছিল ? কেন ছিল ?

২। 'খবর এইটুকু আছে … জেদ বজায় ছিল।'—কাহাদের কথা বলা হইয়াছে? 'যন্ত্রণা ও মৃত্যু' কেন? জেদ কিভাবে বজায় ছিল?

৩। 'এই সব অত্যাচারের ফলে … জ্বলিয়া উঠিল।'—কি প্রকারের অত্যাচার? অত্যাচারী কাহারা ছিল? কি প্রকারের আগুন জ্বলিয়া উঠিল?

৪। 'ক্ষিপ্ত নীলকর সম্প্রদায় … মোকদ্দমা আনিয়াছিলেন।'—নীলকরেরা কেন ক্ষিপ্ত হইরাছিলেন? লঙ্ সাহেব কে ছিলেন? কেন তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা? পরিণাম কি হইয়াছিল?

[গ] **রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

১। প্রাচীন কালে ভারতে নীল প্রস্তুতের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লেখ।

২। ইংরাজ আমলের প্রথম ভাগে বিদেশীরা যে ভাবে নীল উৎপাদনে রত হয়—তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। 'তিনিই ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ইউরোপীয় নীলকর।'—ইঁহার সম্বন্ধে যাহা জান লেখ।

৪। অত্যাচারী নীলকর ও বিচারকদের আচরণ সম্পর্কে যাহা জান লেখ।

৫। নীলকরদের জবরদস্ত অত্যাচার কিরূপ ছিল, নিজের ভাষায় লেখ।

৬। বিদ্রোহীদের চরিত্র সম্বন্ধে যাহা জান লেখ।

৭। কার্যক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিয়া লেখনীর সাহায্যে যাঁহারা প্রজাবর্গের বন্ধু হইয়াছিলেন তাঁহাদের কয়েকজনের নাম কর ও তাঁহাদের বন্ধুত্বের পরিচয় বিবৃত কর।

৮। কত সালে নীল বিদ্রোহ দেখা দিল? বিদ্রোহের কারণ ও রূপ সংক্ষেপে আলোচনা কর।

[ঘ] **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ**

১। 'নিজেকে রাজার জাতি মনে করিরা প্রজাকে ঘৃণা করিতেন।'—প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর।

২। 'তাঁহারা হাসির সঙ্গে … নীরবে সহ্য করিতেন।'—প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর।

[ঙ] **ব্যাকরণভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

১। শব্দার্থসহ বাক্য রচনা কর ঃ দাদন, কুঠিয়াল, একরারনামা, স্থানিক, কালগ্রাসে, প্রকটিত।

২। শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ

ইংরাজ আমলের প্রথম ভাগে … হইতে নীল উৎপাদনের … প্রণালী এদেশে আসে এবং উহার … হইয়াছিলেন একজন … বণিক …।

৩। টীকা লেখ ঃ প্লিনি, ইন্ডিগো, লুই বোনড্, আবুল ফজল, নীলদর্পণ, হিন্দু পেট্রিয়ট, মধুসূদন দত্ত, লঙ সাহেব, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রামকান্ত ও শ্যামচাঁদ।





বর্ষার মাঝামাঝি। পদ্মার ইলিশ মাছ ধরার মরসুম চলিয়াছে। দিবা-রাত্রি কোন সময়েই মাছ ধরিবার কামাই নাই। সন্ধ্যার সময় জাহাজ-ঘাটে দাঁড়াইলে দেখা যায় নদীর বুকে শত শত আলো অনির্বাণ জোনাকির মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জেলে-নৌকার আলো ও-গুলি। সমস্ত রাত্রি আলোগুলি এমনিভাবে নদীবক্ষের রহস্যময় ঘন অন্ধকারে দুর্বোধ্য সঙ্কেতের মত সঞ্চালিত হয়। কুবের মাঝি আজ মাছ ধরিতেছিল দেবীগঞ্জের মাইল দেড়েক উজানে,

নৌকায় আরও দুজন লোক আছে। ধনঞ্জয় ও গণেশ। তিনজনের বাড়িই কেতুপুর গ্রামে।

নৌকাটি বেশী বড় নয়। পিছনের দিকে সামান্য একটু ছাউনি আছে। বর্ষাবাদলে দু'তিনজনে কোনরকমে মাথা গুঁজিয়া থাকিতে পারে। বাকি সবটাই খোলা। মাঝখানে নৌকার পাটাতনে হাত দুই ফাঁক করে রাখা হইয়াছে। এই ফাঁক দিয়া নৌকার খোলের মধ্যে মাছ ধরিয়া জমা করা হয়। জাল ফেলিবার ব্যবস্থা পাশের দিকে। ত্রিকোণ বাঁশের ফ্রেমে বিপুল পাখার মত জালটি নৌকার পাশে লাগানো আছে।

এই নৌকাটি ধনঞ্জয়ের সম্পত্তি। জালটাও তারই। প্রতি রাত্রে যত মাছ ধরা হয় তার অর্ধেক ভাগ ধনঞ্জয়ের, বাকী অর্ধেক কুবের ও গণেশের। নৌকা এবং জালের মালিক বলিয়া ধনঞ্জয় পরিশ্রম করে কম। আগাগোড়া সে শুধু নৌকার হাল ধরিয়া বসিয়া থাকে।

কুবের ও গণেশ হাতল ধরিয়া জালটা জলে নামায় এবং তোলে, মাছগুলি সঞ্চয় করে। একহাত একখানি কাপড়কে নেংটির মত কোমরে জড়াইয়া ক্রমাগত জলে ভিজিয়া, শীতল জলো বাতাসে শীত বোধ করিয়া বিনিদ্র চোখে লন্ঠনের মৃদু আলোয় নদীর অশান্ত জলরাশির দিকে চাহিয়া থাকিয়া কুবের ও গণেশ সমস্ত রাত মাছ ধরে।

নৌকা স্রোতে ভাসিয়া যায়। বৈঠা ধরিয়া নৌকাকে তারা ঠেলিয়া লইয়া আসে সেইখানে যেখানে একবার ঝাঁকের মধ্যে জাল ফেলিয়া বেশী মাছ উঠিয়াছিল। আজও খুব মাছ উঠিতেছিল।

শরীরটা আজ তাহার ভাল ছিল না। তাহার স্ত্রী মালা তাহাকে বাহির হইতে বারণ করিয়াছিল। কিন্তু শরীরের দিকে তাকাইবার অবসর কুবেরের নাই। সারাটা বছর তাহাকে পদ্মার মাছের উপরই নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে। এ নির্ভরও বিশেষ জোরালো নয়, পদ্মার মাছ ধরিবার মত উপযুক্ত জাল তার নাই। ধনঞ্জয় অথবা যদুর সঙ্গে সমস্ত বছর তাহাকে এমনি ভাবে দু-আনা চার-আনা ভাগে মজুরি খাটিতে হইবে। ইলিশের মরশুম ফুরাইলে বিপুলা পদ্মা কৃপণ হইয়া যায়। নিজের বিরাট বিস্তৃতির মাঝে কোনখানে সে যে তার মীনসন্তানগুলিকে লুকাইয়া ফেলে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। নদীর মালিককে খাজনা দিয়া হাজার টাকা দামের জাল যাহারা পাতিতে পারে তাহাদের দল ছাড়িয়া দিয়া, এতবড় পদ্মার বুকে জীবিকা অর্জন করা তাহার মত গরিব জেলের পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার।

শরীর থাক আর যাক, এ সময় একটা রাত্রিও ঘরে বসিয়া থাকিলে

কুবেরের চলিবে না। মাঝরাত্রে একবার তাহারা খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছে। রাত্রিশেষ হইয়া আসিলে কুবের বলিল, একটু জিরাইগো আজান খুড়া। উহুঁ, তামুক বিনা গায়ে সাড় লাগে না। জাল উঁচু করিয়া রাখিয়া কুবের ও গণেশ ছইয়ের সামনে বসিল। ছইয়ের গায়ে আটকানো ছোট হুঁকাটি নামাইয়া টিনের কৌটা হইতে কড়া দা-কাটা তামাক বাহির করিয়া দেড় বছর ধরিয়া ব্যবহৃত পুরাতন কল্কিটিকে সাজিল কুবের।

কুবেরের পাশে গণেশ বসিয়া বাড়াবাড়ি রকমের কাঁপিতেছিল। এ যেন সত্যসত্যই শীতকাল। বলিল, ইঃ আজ কি জাড় কুবির।

পুড়িয়া শেষ হওয়া অবধি তাহারা পালা করিয়া তামাক টানিল। নৌকা এখন অনেক দূরে আগাইয়া আসিয়াছে।

পূর্বদিক লাল হইয়া উঠা পর্যন্ত তাহারা জাল ফেলিয়া বেড়াইল। তারপর রওনা হইল জাহাজ-ঘাটের দিকে। সেখানে পৌঁছিতে চারিদিক আলো হইয়া উঠিল।

মেছো নৌকার ঘাটটি একপাশে। ইতিমধ্যে অনেকগুলি নৌকা মাছ লইয়া হাজির হইয়াছে। হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকিতে স্থানটি হইয়া উঠিয়াছে সরগরম। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে দরাদরি সম্পন্ন হইয়া হরদম মাছ কেনাবেচা চলিতেছে। চালানের ব্যবস্থাও হইতেছে সঙ্গে সঙ্গেই।

নেংটি ছাড়িয়া তিন-হাতি ছোট ময়লা কাপড়খানি পরিয়া কুবের তীরে উঠিল। কাদার মধ্যেই একটা লোহার চেয়ার ও কাঠের টেবিল পাতিয়া চালান বাবু কেদারনাথ মাছ গোণা দেখিয়া খাতায় লিখিয়া যাইতেছে। একশ' মাছ গোণা হইবামাত্র তার চাকরটা ছোঁ মারিয়া চালান বাবুর চাঁদা পাঁচটি মাছ মস্ত একটা কেরোসিন কাঠের বাক্সে ভরিয়া ফেলিতেছে। পাশেই কাঠের প্যাকিং কেসে একসারি মাছ ও এক পরত করিয়া বরফ বিছাইয়া চালানের ব্যবস্থা হইতেছে। খানিক দূরে মেন লাইন হইতে গায়ের জোরে টানিয়া আনা একজোড়া উঁচুনীচু ও প্রায় অকেজো লাইনের উপর চার পাঁচটা ওয়াগন দাঁড়াইয়া আছে। মাছের বোঝাই লইয়া যথাসময়ে ওয়াগনগুলি কলিকাতায় পৌঁছিবে। সকালে বিকালে বাজারে বাজারে ইলিশ কিনিয়া কলিকাতার মানুষ ফিরিবে বাড়ি। কলিকাতার বাতাসে পাওয়া যাইবে পদ্মার ইলিশ মাছ ভাজার গন্ধ।

একটা ওয়াগনের আড়ালে দাঁড়াইয়া লম্বা শার্ট গায়ে বেঁটে ও মোটা এক ব্যক্তি অনেকক্ষণ হইতে কুবেরের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছিল। কুবের তাহার দিকে চাহিতেই সে হাতছানি দিয়া ডাকিল। কুবের

খানিকক্ষণ নড়িল না। উদাসভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর কাছে গিয়া বলিল, কী ক'ন?

সে রাগ করিয়া বলিল, কী ক'ন! জানস না? মাছ লইয়া আয়। তিনডা আনিস।

কুবের মাথা নাড়িল, আইজ পারুম না শেতলবাবু। আজান খুড়া সিদা মোর দিকে চাইয়া রইছে দেখ না। বাজারে কেনো গা আইজ।

কিন্তু কুবের চুরি করিয়া যে দামে মাছ দেয় বাজারে কিনিতে গেলে তার দ্বিগুণ দাম পড়িবে। শীতল তাই হঠাৎ আশা ছাড়িতে পারিল না। সে মিনতি করিয়া বলিল, তিনটা মাছ আইজ তুই দে কুবের। পয়সা না হয় কয়ডা বেশীই লইস, আঁই?

তা'লি খানিক খাড়াও শেতলবাবু।

কুবের ফিরিয়া গিয়া কাপড়টা ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া নৌকায় বসিল। চারিদিকে নজর রাখিয়া তিনটি মাছ কুবের এক সময় গায়ের কাপড়ের তলে লুকাইয়া ফেলিল। তীরে উঠিয়া শীতলের হাতে দিতেই মাছ কটা সে চটের থলির মধ্যে পুরিয়া ফেলিল।

পয়সা কাইল দিমু কুবের। বলিয়া সে চলিয়া যায়, কুবেরও সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়াইয়া বলিল, র'ন শেতলবাবু, অমন ত্বরা কইরা যাইবেন না, দামটা দ্যান দেখি।

কাইল দিমু কইলাম যে?

অ'ই অখন দ্যান। খামু না? পোলাগো খাওয়ামু না?

পয়সা নাই ত দিমু কি? কাইল দিমু, ঠিক দিমু।

পিছল নরম মাটিতে পায়ের বুড়ো আঙুল গাঁথিয়া গাঁথিয়া শীতল চলিয়া গেল। আরক্ত চোখে তাহার দিকে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে কুবের বলিল, ডাকাইত। তারপর নৌকায় গিয়া গলুইয়ের দিকে গা এলাইয়া শুইয়া পড়িল।

ধনঞ্জয় নৌকায় আসিলে কুবের জিজ্ঞাসা করিল, কতটা মাছ হইল, আজান খুড়া? শ-চারের কম না, অ্যাঁ?

ধনঞ্জয় মুখে একটা অবজ্ঞাসূচক শব্দ করিয়া বলিল, চাইরশ না হাজার! দুইশ সাতপঞ্চাশখান মাছ। সাতটা ফাউ নিয়া আড়াইশর দাম দিছে।

কুবের উঠিয়া বসিল। ইটা কি কও খুড়া? কাইল যে এক্কেরে মাছ পড়ে নাই, কাইল না দুইশ সাতাশটা মাছ হইছিল?

ধনঞ্জয় তৎক্ষণাৎ রাগ করিয়া বলিল, মিছা কথা কইলাম নাকি রে কুবের?

কুবের নরম হইয়া বলিল, তা কই নাই খুড়া। মিছা কওনের মানুষ তুমি না। মাছ নি কাল বেশী বেশী পড়ছিল তাই, ভাবলাম তোমারে বুঝি চালানবাবু ঠকাইছে।

ঘুমে ও শ্রান্তিতে কুবেরের চোখ দুটি বুজিয়া আসিতে চায় আর সেই নিমীলনপিপাসু চোখে রাগে দুঃখে আসিতে চায় জল। গরীবের মধ্যে সে গরীব, ছোটলোকের মধ্যে আরও বেশী ছোটলোক।

এমনভাবে তাহাকে বঞ্চিত করিবার অধিকারটা সকলের তাই প্রথার মত, সামাজিক ও ধর্মসম্পর্কীয় দশটা নিয়মের মত অসংকোচে গ্রহণ করিয়াছে সে। প্রতিবাদ করিতেও পারিবে না।

অনুশীলনী

পাঠ-সংকেত ঃ লেখকের বিখ্যাত উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি' হইতে অংশটি গ্রহণ করা হইয়াছে। সাধারণ ভাবে পদ্মা নদীর দরিদ্র মাল্লা ও মৎস্যজীবীদের জবীন লইয়াই ইহা রচিত। প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহারা বাঁচে। এই অংশে তাহাদের নিরলস কর্ম, অপরিমেয় পরিশ্রম—উপরন্তু অজস্র নিষ্ঠুর বঞ্চনার কিছুটা মাত্র এখানে উৎকলিত। পূর্ববঙ্গের স্থানীয় ভাষাটিও লক্ষ্যণীয়।

[ক] **মৌখিক প্রশ্ন ঃ**

১। এই গল্পাংশের রচয়িতা কে? তাঁহার খ্যাতি কেন?
২। এই গল্পাংশের কথোপকথন কোন্ ভাষায় রচিত?
৩। পদ্মা সম্পর্কে পৌরাণিক প্রসঙ্গ কি?
৪। পদ্মার ভৌগোলিক অবস্থান বর্তমানে কোথায়?

[খ] **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

১। 'আগাগোড়া সে শুধু হাল ধরিয়া বসিয়া থাকে।'—এ ব্যক্তি কে? নৌকার সহিত তাহার সম্পর্ক কি? কেন সে শুধু বসিয়া থাকে? মাছ ধরে কে? ভাগ তাহারা কি পায়?
২। 'সারাটা বছর তাহাকে এ নির্ভরতা বিশেষ জোরালো নয়।'—এখানে কাহার কথা বলা হইতেছে? নির্ভর জোরালো নয় কেন? তাহার অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। তাহার বাড়ি কোন্ গ্রামে?
৩। মাছের ভাগাভাগিটা হয় কি প্রকারের? সেখানে কোনো প্রকারের বঞ্চনা লক্ষ্য কর কি?

৪। 'শরীর থাক আর যাক ··· চলিবে না।'—কেন চলিবে না? সারা রাত্রি সে কি করে? যে অবস্থায় সে কাজ করে—সংক্ষেপে বল।

৫। 'একশ' মাছ গোনা ··· ভরিয়া ফেলিতেছে।'—চালান বাবুর নাম কি? এখানে চাঁদার অর্থ কি? কোথায় মাছ গোণা হইতেছে?

[গ] **রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

১। 'কুবের ও গণেশ সমস্ত রাত্রি মাছ ধরে।'—কোথায়, কি অবস্থায় এই মাছ ধরা, কি তাহার পরিবেশ, দরিদ্র জেলেদের অবস্থাই বা কিরূপ, সংক্ষেপে তাহা বিবৃত কর।

২। 'চালানের ব্যবস্থাও হইতেছে সঙ্গে সঙ্গেই।'—এই চালান-ব্যবস্থার একটি বর্ণনা দাও।

৩। শেতলবাবুর একটি চরিত্রচিত্র বিবৃত কর।

৪। নৌকার মালিক ধনঞ্জয়ের চরিত্রচিত্র রচনা কর।

[ঘ] **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ**

১। 'সমস্ত রাত্রি আলোগুলি ··· সঞ্চালিত হয়।' প্রসঙ্গ উল্লেখসহ ব্যাখ্যা কর।

২। 'নিজের বিরাট বিস্তৃতির মাঝে ··· কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।'—প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর।

৩। 'কলিকাতার বাতাসে ··· মাছ ভাজার গন্ধ।'—প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর।

৪। 'এমনভাবে তাহাকে বঞ্চিত ··· গ্রহণ করিয়াছে সে।'—প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর।

[ঙ] **ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ**

১। শব্দার্থ ঃ জানস, পারুম, কয়ডা, থামু, পোলাগো, নিমীলন।

২। সমাস নির্ণয় কর ঃ অনির্বাণ, বর্ষাবাদলে, আগাগোড়া, অশান্ত, দা-কাটা, সরগরম, তিন-হাতি, অসংকোচ, ত্রিকোণ, দরাদরি।

৩। নিম্নোধৃত স্তবকটি পড়িয়া ধনঞ্জয় ও কুবেরের কথোপকথন হইতে প্রার্থিত উত্তরগুলি দাও ঃ

'ধনঞ্জয় তৎক্ষণাৎ রাগ করিয়া ··· চালানবাবু ঠকাইছে।'

—ধনঞ্জয় রাগিল কেন?

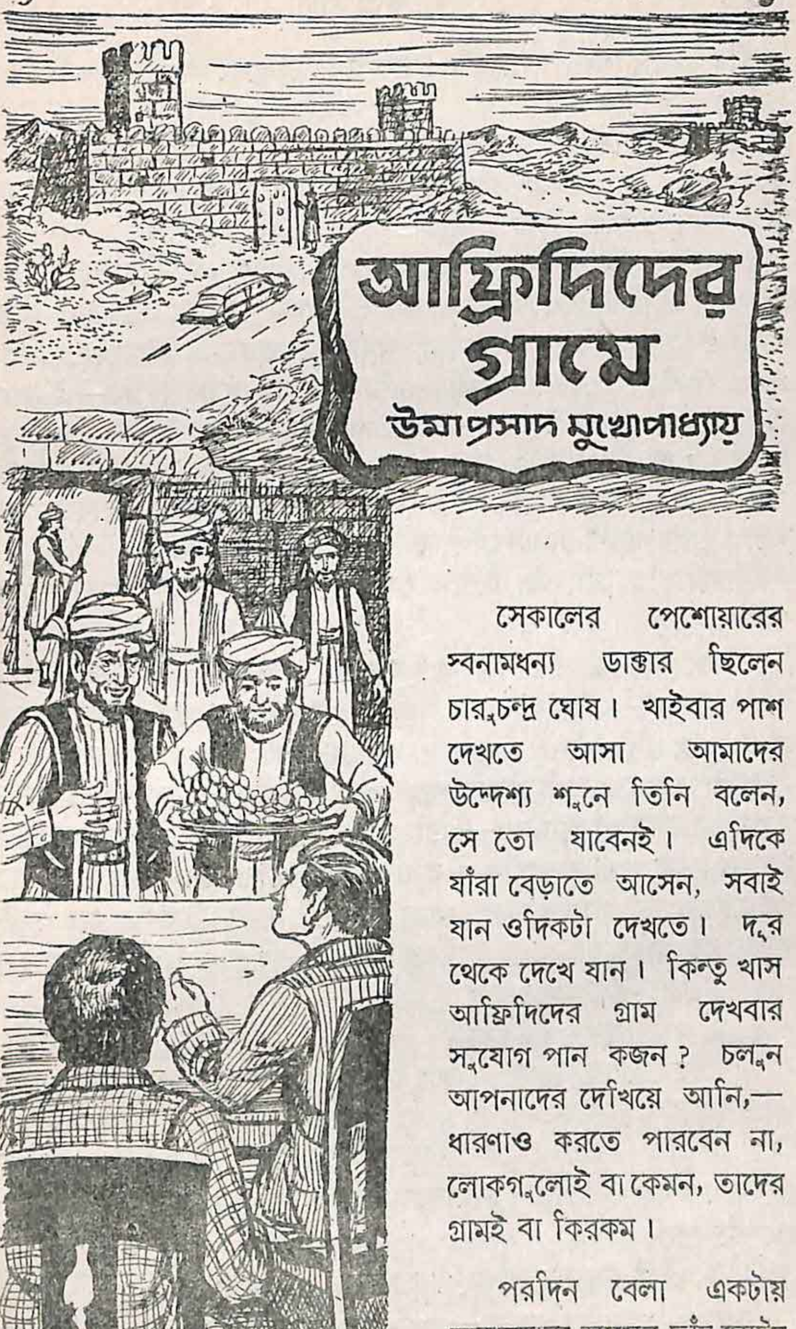
—ধনঞ্জয় কি মিথ্যা বলিয়াছে?

—কুবের নরম হইল কেন?

—কুবেরের কথা মতো, সত্যই কি চালানবাবু ধনঞ্জয়কে ঠকাইয়াছে? আসল ব্যাপার কি, তোমার মতামত লিপিবদ্ধ কর।

আফ্রিদিদের গ্রামে

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়



সেকালের পেশোয়ারের স্বনামধন্য ডাক্তার ছিলেন চারুচন্দ্র ঘোষ। খাইবার পাশ দেখতে আসা আমাদের উদ্দেশ্য শুনে তিনি বলেন, সে তো যাবেনই। এদিকে যাঁরা বেড়াতে আসেন, সবাই যান ওদিকটা দেখতে। দূর থেকে দেখে যান। কিন্তু খাস আফ্রিদিদের গ্রাম দেখবার সুযোগ পান কজন? চলুন আপনাদের দেখিয়ে আনি,—ধারণাও করতে পারবেন না, লোকগুলোই বা কেমন, তাদের গ্রামই বা কিরকম।

পরদিন বেলা একটায় ডাক্তারবাবু আসেন তাঁর মোটর নিয়ে। যাত্রা সুরু হয়। মনে

অসীম কৌতূহল। পরাধীন ভারতের উপান্তে স্বাধীন আফ্রিদিদের গ্রাম দেখতে চলেছি।

প্রশস্ত বাঁধানো রাজপথ। দুপাশে ধূ ধূ করে শুষ্ক বালু—কাঁকরময়। দিগন্ত বিস্তীর্ণ প্রান্তর। যেন মরুপ্রদেশ। তারই বুকে মাঝে মাঝে পাহাড়।

ডাক্তার বলেন, যে রাস্তা দিয়ে চলেছি এইটুকুই ইংরেজদের—আর দু'পাশে আফ্রিদি অঞ্চল। ওরা কারও বশ্যতা স্বীকার করে না। আফগানিস্তানের আমীরকেও মানে না, বৃটিশদেরও নয়। ঐ দেখুন, মাঝে মাঝে মাঠের মধ্যে বড় বড় পাঁচিল ঘেরা দুর্গের মত—ঐ হলো আফ্রিদিদের এক একটা গ্রাম। প্রত্যেক গ্রামের মধ্যে থেকে মাথা তুলে চিলে ঘর বা টাওয়ার মতো দেখছেন, ওগুলো ওয়াচ-টাওয়ার বা 'সুটিং বক্স'। ওরা ঐখানে রাইফেল নিয়ে বসে পাহারা দেয়। দরকার বুঝলেই শত্রুর ওপর গুলী চালায় দেওয়ালের ফোকরের মধ্যে দিয়ে।

প্রশ্ন করি, এরা এল এখানে কোথা থেকে? এরাই কি এখানকার আদিবাসী?

ডাক্তার বলেন, ভারতবর্ষ আর আফগানিস্তানের মাঝখানে এই যে পাহাড় অঞ্চল—এইটেরই এখন নাম হয়েছে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বা ট্রাইবাল টেরিটারি। এরা আফগানের মত জাতে পাঠান। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। এরা নিজেদের বলে পুখ্‌তুনঅলা—ওদের ভাষা পুস্ত। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের অভিমত—এরা তুর্ক-ইরাণীয় জাতি পর্যায়ের, তবে বহু লোকের মধ্যে ভারতীয় ও অন্য জাতির রক্তের সংমিশ্রণও দেখা যায়। এইবার দেখবেন তাদের গ্রাম, কোন গ্রামের কিন্তু নিজস্ব নাম নেই। সর্দার বা মালিকের নামে গ্রামের পরিচয়—যে গ্রামে এখনি ঢুকবো এর নাম উলিয়াস খাঁ কিলি।

অর্থাৎ উলিয়াস খাঁর কেল্লা। গ্রাম তো নয়, ভাবি, কেল্লাই বটে।

কাঁটাতারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে মোটর মাঠের মধ্যে ঢোকে। একটু এগিয়ে গ্রামের সুমুখে দাঁড়ায়। প্রকাণ্ড উঁচু পাঁচিল। পাথর ও মাটি দিয়ে তৈরী। বাইরে থেকে গ্রামের ভেতর কোন কিছু দেখা যায় না। প্রবেশ পথ মাত্র একটি। সিংদরজার মত। ডাক্তারবাবু তিনবার হর্ন বাজাতে বলেন।

বলি, ঐটে সংকেত নাকি? আলিবাবার চিচিংফাক?

ডাক্তার বলেন, দেখুন না—এখনি দরজা খুলে যাবে। ওরা ওপরের ওয়াচ টাওয়ার থেকে দেখে নিয়েছে আগেই।

দরজা ভেতর থেকে খুলে যায়। জন পাঁচেক আফ্রিদি বেরিয়ে আসেন। সামনেই সর্দার-মালিক, দেখেই বোঝা যায়। সকলেই লম্বা দোহারা শরীর। ব্যায়ামবীরের মত সুগঠন। সুপুরুষও। উজ্জ্বল ফর্সা রং। লম্বা ধরনের মুখাকৃতি। টানা বড় বড় চোখ—নীলাভ ভাব। তীক্ষ্ণ ফলার মত নাক। মুখে দাড়ি-গোঁফ। মাথায় পাগড়ি। পরণে ঢলঢলে সালোয়ার। গায়ে ঝোলা পাঞ্জাবী, আলখাল্লার মত, কারও বা তার ওপর কোট বা ওয়েস্ট কোট। সবারই কাঁধে রাইফেল বা বন্দুক। সর্দার বৃদ্ধ। সৌম হাবভাব। বয়সের ভারে দেহ নুয়ে পড়েনি। দীর্ঘ পদক্ষেপে হন হন করে এগিয়ে আসেন মোটরের দিকে। আমরাও নেমে দাঁড়াই। ডাঃ ঘোষ কয়েক পা এগিয়ে যান। তাঁকে দেখে সর্দারের মুখে আনন্দোজ্জ্বল হাসি ফোটে। সরল শিশুর হাসির মত স্বচ্ছ। দুজনেই হাত বাড়ান। পরস্পরের করমর্দন চলে সোৎসাহে ও প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে। আর দুজনেরই মুখে একই কথা খই ফোটার মত ফুটতে থাকে। বাক্য-স্রোতের বেগ ক্রমশঃই দ্রুততর হয়, হাতের ঝাঁকুনিও ঝড়ের মুখে গাছের ডালের মত প্রবলভাবে নাচতে থাকে।

অবাক হয়ে দেখি, বন্ধু মিলনের ও অভ্যর্থনার এই অদ্ভুত দৃশ্য। কথাগুলি শুনতে এই ধরণের—

জোড়ে ? খ-জোড়ে ? খ-তকড়ে ? খুশিয়াল দে ? ঢের খুশিয়াল দে ? খ-খ-খ খুশিয়াল দে। তারপর যেন কেবলমাত্র খ-খ-খ, এইভাবেই কিছুক্ষণ চলে।

বাড়ি ফিরে পরে ডাক্তারবাবুর কাছে কথাগুলির অর্থ জানতে চাই। তিনি জানান, আমাদের যেমন প্রথা, নমস্কার বা প্রণাম, আফ্রিদিদের তেমনি এই হোল অভিবাদন। এর ভাবার্থ হোল ঃ গায়ের জোর ঠিক আছে ? খুব শক্তি আছে ? খুব কর্মক্ষম ? দিল খুশি ! খুব খুশি ? ঢের খুশি ? খুব খুব খুব খুশি ?—খ মানে খুব এবং শেষ পর্যন্ত খ-খ-খ—এই খ-এর খেলাই চলতে থাকে।

যেমন বীরের জাত, তেমনি ভীম আকৃতি, তেমনি বীরত্বব্যঞ্জক অভিবাদন পদ্ধতি।

সর্দার সকলকে সমাদরে গ্রামের মধ্যে নিয়ে চলেন। ভিতরে মাঝখানে চতুষ্কোণ বিশাল প্রাঙ্গণ। শুকনো খটখটে। বালি কাঁকর ভরা। বাইরে যে দিগন্তজোড়া মরুপ্রান্ত তারই একটা সামান্য ফালি যেন পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রাখা। সেই খোলা জায়গায় এখানে ওখানে খাটিয়া পাতা, কোথাও অতি সাধারণ কাঠের দু-একটা চেয়ার টেবিল। প্রাঙ্গণের

চারিদিক ঘিরে পাঁচিলের গায়ে সারি সারি ঘর একতলা, দোতলা। কোন বাড়ির নীচের তলায় খোলা দালান। মাটি ও পাথর দিয়ে তৈরী। কেমন যেন নীরস, কর্কশ, রুক্ষ। যেমন অধিবাসী, তেমনি তাদের বাসস্থানও। যেন ধারালো তলোয়ার আর তার খাপ।

ডাক্তার পুস্তভাষায় মালিকের সঙ্গে কথা বলেন। কি কথা চলে, কিছুই বুঝি না। সর্দার হেসে একবার কি যেন অনুমোদন করেন, আমাদের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়েন। সকলকে নিয়ে এগিয়ে চলেন একটা একতলার খোলা দালানে। দেখে মনে হয়, কামারশাল। কয়জন আফ্রিদি লোহার লম্বা নল নিয়ে একটা যন্ত্রের সাহায্যে 'বোর্'—অর্থাৎ ছেঁদা করছে। পাশে লোহার কুচি জমছে। ডাক্তার দেখিয়ে বলেন, দেখছেন, কী তৈরী হচ্ছে ? রাইফেল। এইভাবে প্রত্যেক গ্রামে নিজেরা তৈরী করে। মান্ধাতা আমলের—গ্রাম্য পদ্ধতি। অসীম পরিশ্রম ক'রে হাতে তৈরী করছে। কিন্তু জিনিস যা করে আশ্চর্যরকম ভাল। কিছুদিন আগে এক রাশিয়ান এসেছিলেন, তিনি পরীক্ষা করে বলে গেলেন, তাঁদের দেশের ফ্যাকটারীতে তৈরী ভাল রাইফেলের চেয়ে এগুলি কোন অংশে খারাপ নয়।

স্মারক স্বরূপ রাইফেল তৈরীর লোহা কুচি কতকগুলি পকেটে পুরি। তাতেও খানিক আনন্দ।

আঙ্গিনায় ফিরে, টেবিল ঘিরে, চেয়ার ও খাটিয়ায় সকলে বসি। সর্দারের কি এক কথায় ডাক্তার সম্মতি জানান। সর্দার উঠে যান।

ডাক্তার বলেন, উনি বলছিলেন, গ্রামে আপনারা অতিথি এসেছেন, চায়ের ব্যবস্থা করেছেন। এদের হিংসাবৃত্তি ও প্রতিশোধ নেবার দুর্দম স্বভাব থাকলেও তার ওপর একটা অতি শান্তশিষ্ট সামাজিক আচরণকে স্থান দেয়, সেটা হোল এদের অকুণ্ঠ আতিথেয়তা। অতিথি এলে তার আদর যত্ন আপ্যায়ন ত করবেই, যে কেউ এসে আশ্রয় চাইলেও তাকে আশ্রয় দেবে। এমন কি পরম শত্রু এসেও আশ্রয় ভিক্ষা করলে তাকে সাদরে রাখবে এবং যতক্ষণ আশ্রয়ে থাকবে তার গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত না লাগে তা দেখবে।

সর্দার ফিরে আসেন। সঙ্গে আর একজন লোক। হাতে তার থালা ভর্তি আঙ্গুর, বাদাম, আখরোট—শুকনো মেওয়া। টেবিলের উপর রাখে। সর্দার লজ্জিত মুখে অতি সঙ্কোচভরে ডাক্তার বাবুকে ফিস ফিস করে কি যেন বলেন। ডাক্তার হাসতে হাসতে আমাদের বলেন, ব্যাপারটা কি বুঝতে পারলেন ? মালিক ভীষণ লজ্জায় পড়েছেন।

এখানে গরুমোষ কম—এদের সব ভেড়াভেড়ী। দিনের বেলা বাইরে চরতে গেছে। ঘরে দুধ নেই। অতিথিদের বিনা দুধে চা খেতে দেন কি করে—এই হয়েছে দুর্ভাবনা।

আমি বললাম, সেই চা-ই খাবো, এতে লজ্জা কিসের।

কিন্তু দেখুন মজা,—বাইরে থেকে এমন কাঠখোট্টা নীরস লোক, দুর্ধর্ষ প্রকৃতি—দয়া মায়া লজ্জা সরমের বুঝি বালাই নেই, অথচ এই সামান্য ব্যাপারেই কী রকম লজ্জিত ও সংকুচিত হয়ে পড়েছিলেন—পাছে অতিথিদের কোন ত্রুটি ঘটে যায়। চা খাবার সময় আর একজন আফ্রিদি আসে। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে খানিক কথা বলে চলে যায়। ডাক্তারবাবু মুচকি হেসে আমাদের বললেন, লোকটা ইংরাজদের মাইনে খাওয়া পুলিসের লোক। এসেছিল খোঁজখবর নিতে। আমাকে অবশ্য চেনে। দেখছেন তো, আফ্রিদিদের মধ্যেও টাকা বিলিয়ে কি রকম গুপ্তচরের ব্যবস্থা ইংরেজ করেছে।

অনুশীলনী

পাঠ-সংকেত ঃ লেখক ভারতের বহু দুর্গম স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন। বর্তমান পাঠ্য অংশে সে পরিচয় কিছুটা সুস্পষ্ট। আমাদের প্রায় প্রতিবেশী এই আফ্রিদিরা। একদা ইংরাজদের অপপ্রচারে ইহাদের কেবল দুর্ধর্ষ নিষ্ঠুর রূপেই চিত্রিত করা হইত। কিন্তু লেখক সে ভ্রান্তি দূর করিয়া ইহাদের আতিথেয়তা, সৌজন্য, সরল জীবনচর্যা সুন্দর ভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন। কঠিন জীবনচর্যা ও চরিত্রের অন্তরালে ইহাদের হৃদয়ের কোমলতার অভাব নাই। এ রচনা ভারতের পরাধীনতা কালে রচিত।

[ক] **মৌখিক প্রশ্ন ঃ**

১। এই ভ্রমণকাহিনী রচয়িতার নাম কি ? এ প্রবন্ধাংশের নামকরণ কি ঠিক হইয়াছে ?

২। খাইবার পাশ কি ? ইহা কোথায় ?

৩। আফ্রিদিরা কোন্ অঞ্চলের মানুষ ?

৪। 'ওয়াচ টাওয়ার' কোন্ ভাষা ? ইহার মানে কি ? ওগুলোর আবশ্যকতা কি ?

৫। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী বলিতে কি বুঝ ?

[খ] **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

১। 'চলুন, আপনাদের ··· গ্রামই বা কি রকম।'—বক্তা কে? তিনি কি দেখাইতে লইয়া যাইবেন? এখানে কাহাদের কথা হইতেছে? তাহাদের ভৌগোলিক অবস্থান কোথায়?

২। 'ঐখানে রাইফেল নিয়ে বসে পাহারা দেয়।'—বক্তা কে? কাহাকে বলিতেছেন? কোথায় কাহারা পাহারা দেয়? কেন পাহারা দেয়?

৩। 'কোন গ্রামের কিন্তু নিজস্ব নাম নেই।'—তবে গ্রামের নামকরণের পদ্ধতি কি? যে-গ্রামে লেখক গেলেন তার নাম কি?

৪। 'বলি, ঐটে সংকেত নাকি? আলিবাবার চিচিংফাঁক?'—সংকেতটা কিরূপ ছিল? এ ঘটনা কোথায় ঘটিতেছে? সংকেতের পর কি ঘটিল? চিচিংফাঁকের প্রসঙ্গ কেন?

৫। 'অবাক হয়ে দেখি, বন্ধু মিলনের ও অভ্যর্থনার এই অদ্ভুত দৃশ্য।' —বন্ধু বলিতে কাহাদের বুঝাইতেছে? অভ্যর্থনার দৃশ্যটি কিরূপ ছিল? লেখক অবাক হইলেন কেন?

৬। 'চা খাবার সময় আর একজন আফ্রিদি আসে।'—লোকটির পরিচয় কি? এই আগমনের উদ্দেশ্য কি?

[গ] **রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

১। আফ্রিদিদের সামান্য পরিচয়সহ উহাদের গ্রামের সংক্ষিপ্ত একটি লিপিচিত্র রচনা কর।

২। "এরা এল এখানে কোথা থেকে ··· আদিবাসী? স্থানটি কোথায়? আফ্রিদিদের জাতি ও ভাষার পরিচয় দাও।

৩। আফ্রিদিদের গ্রামের ভিতরের একটি চিত্র দাও।

৪। আফ্রিদিদের বন্দুক তৈরীর কারখানা ও উহার উৎকর্ষ বিষয়ে লেখকের অভিজ্ঞতা কি?

৫। আফ্রিদিদের আতিথেয়তা বিষয়ে আলোচনা কর।

[ঘ] **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ**

১। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর ঃ

—অর্থাৎ উলিয়াস খাঁর কেল্লা ··· কেল্লাই বটে!'

—'যেমন বীরের জাত ··· অভিবাদন পদ্ধতি।'

—'তাতেও খানিকটা আনন্দ।' ব্যাখ্যাসহ 'আনন্দ' কথাটির তাৎপর্য বুঝাও। কেন আনন্দ?

৬ **ব্যাকরণভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

১। শব্দার্থ ও বাক্যরচনা কর ঃ
দোহারা, স্মারক, মেওয়া, উপান্তে, কাটখোট্টা।

২। সমাস নির্ণয় কর ঃ
রাজপথ, দিগন্তবিস্তীর্ণ, উপান্তে, সিংদরজা, আনন্দোজ্জ্বল, দিগন্তজোড়া, কাটখোট্টা, শান্তশিষ্ট।

৩। টীকা রচনা কর ঃ
খাইবার পাশ, আফ্রিদি, আলিবাবার চিচিংফাঁক, বাস্তু।

৪। শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ
এসেছিল ··· নিতে। আমাকে অবশ্য ···। দেখছেন তো, ··· মধ্যেও টাকা বিলিয়ে কি রকম ··· ব্যবস্থা ··· করেছে।

৫। ভুল সংশোধন কর ঃ

এদের অহিংসাবৃত্তি ও পরিশোধ নেবার দুর্দম স্বভাব থাকলেও তার ওপর একটা অতি শান্তশিষ্ট অসামাজিক আচরণকে স্থান দেয়, সেটা হোলো এদের কুণ্ঠিত আথিতেয়তা। অতিথি এলে তার আদর যত্ন আপ্যায়ন তো করবেই। এমন কি পরম মিত্র এসেও আশ্রয় ভিক্ষা করলে তাকে সাদরে রাখবে।

৬। স্তবকটি পাঠ করিয়া নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ

ভারতবর্ষ আর আফগানিস্তানের মাঝখানে এই যে পাহাড় অঞ্চল— এইটেরই এখন নাম হয়েছে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বা ট্রাইবেল টেরিটারি। এরা আফগানের মত জাতে পাঠান। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। এরা নিজেদের বলে পুখ্‌তুনঅলা—ওদের ভাষা পুস্তু। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের অভিমত— এরা তুর্ক-ইরানীয় জাতি পর্যায়ের, তবে বহুলোকের মধ্যে ভারতীয় ও অন্যজাতির রক্তের সংমিশ্রণও দেখা যায়। এইবার দেখবেন তাদের গ্রাম, কোন গ্রামের কিন্তু নিজস্ব নাম নেই।

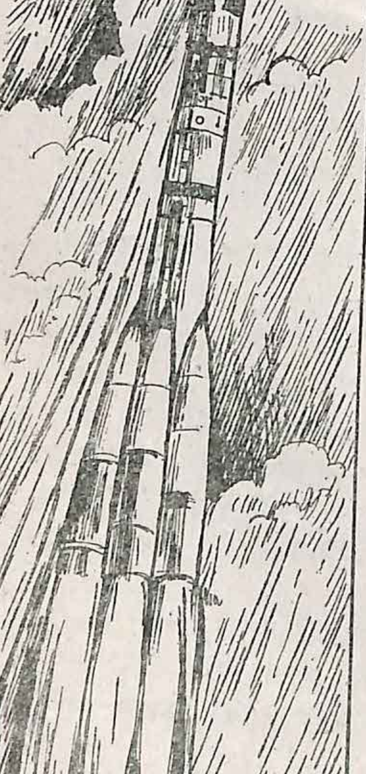
—ট্রাইবেল টেরিটারি বলতে কি বুঝ? এখানে কোন্ অধিবাসী বাস করে? জায়গাটি কোথায়?

—ইহারা কোন্ জাতি পর্যায়ের? ইহাদের সংকর বর্ণের বলা যায় কি?

—গ্রামের নামে ইহাদের বৈশিষ্ট্য কি?



মহাকাশ অভিযান



অজানাকে জানবার, অজেয়কে জয় করবার ইচ্ছা মানুষের চির-কালের মহান এক সাধনা। এই সাধনায় সপ্ত সমুদ্রবেষ্টিত পৃথিবী তার পদানত। কিন্তু অজেয় থেকে গিয়েছিল মহাকাশ —মহাশূন্য।

প্রায় শতাধিক বর্ষ ধরে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা মাঝে মাঝে বেলুনে চড়ে বায়ুমন্ডলে বিচরণ করেছেন—আবহাওয়া মন্ডলের নানা খোঁজ-খবর নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তা ঊর্ধ্বাকাশে মাত্র ১৫-২০ মাইলের মধ্যে। কারণ ওইটুকু জায়গার মধ্যে আছে ওজন হিসেবে বায়ুর শতকরা ৯৯ ভাগ মাত্র। তার ওপরে বায়ু এত হাল্‌কা যে বেলুন সেখানে ভেসে থাকতে পারে না। বাতাস না থাকলে

প্রপেলর বা বায়ু চলন-চক্র দ্বারা চালিত এরোপ্লেনও উড়ে যেতে পারে না। বায়ুবিরল সেই অনন্ত মহাশূন্যকে তবে কি মানুষ কোনো দিনই জয় করতে পারবে না ?

বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে এল তার সেই অজেয়কে জয় করার যুগ ! বিজ্ঞানের সাধনা এবং অসামান্য প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে নূতনতর এক প্রণালীতে মানুষ সফল হলো তার সুদূর মহাকাশ অভিযানে। এই নূতনতর প্রণালীটি হলো 'রকেটে'র সাহায্যে অভিযান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল থেকে এই 'রকেট' নামটা সকলেরই প্রায় পরিচিত। ভয়ংকর এক ক্ষেপণাস্ত্র হিসেবে জার্মানীর ভি-২ রকেট গত বিশ্বযুদ্ধে মারাত্মক এক ভূমিকা নিয়েছিল। সাংঘাতিক মারণাস্ত্র হিসেবে ধ্বংস ও মৃত্যুকে তা ছড়িয়ে দিয়েছিল সারা ইওরোপে ! কিন্তু মানুষের বিজ্ঞান-সাধনার পরিণাম কি এই ধ্বংস ? তাতে মানুষের গৌরব কোথায় ? তাই দেখি, বিজ্ঞানীর সাধনা ওই মহাযুদ্ধেই শেষ হলো না ! ওই যুদ্ধের দশ বছর পরেই বিশ্ববাসী সবিস্ময়ে দেখল 'রকেটে'র নূতন ভূমিকা। মহাবেগবান ওই ভয়াবহ ক্ষেপণাস্ত্র 'রকেটে'র সাহায্যেই সোভিয়েট রাশিয়া স্পুটনিক-১ নামে এক নকল উপগ্রহ পাঠাল মহাকাশে। নকল চাঁদের মত সেটি আমাদের পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে ঘুরতে লাগল। বিশ্বে উঠল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার জয়ধ্বনি। ধ্বংস নয়—সর্বজয়ী মানুষের সৃষ্টির জয়ধ্বনি !

বর্তমানে মহাকাশ যাত্রার এই যানটির গঠন-কৌশল, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রযুক্তিবিদ্যার সমন্বয়ে জটিল খুবই, সন্দেহ নেই। তবু আমাদের প্রায় হাজার বছরের পুরাণো হাউই বাজী দিয়ে একে মোটামুটি বোঝা যেতে পারে। আমরা জানি, হাউইয়ের খোলের নীচের দিকে বারুদ ঠাসা হয়। হাউইকে ঊর্ধ্বমুখী করে নীচের বারুদে আগুন ধরিয়ে দিলেই হাউই তীব্রবেগে উপর দিকে ছুটে যায়। তেমনি রকেটও। রকেটের ধাতব খোল—কুঠুরির পর কুঠুরি দিয়ে সাজানো। প্রত্যেক কুঠুরিতে থাকে গতি-সঞ্চারক তরল জ্বালানী আর তরল অক্সিজেন। ওই তরল অক্সিজেনের সাহায্যে তরল জ্বালানী পুড়ে তৈরী হয় গ্যাস। সেই গ্যাস রকেটের পেছনের সরু নল-পথ দিয়ে বেরিয়ে আসে সবেগে। নিউটনের এক গতিসূত্র অনুসারে—প্রতিটি ক্রিয়ার ফলে সমপরিমাণ বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এই নিয়মেই—নীচের দিকে ঝাপটা মেরে পাখী শূন্যে উড়ে যায়। এই নিয়মই কাজ করে রকেটের ক্ষেত্রেও। রকেটের পেছনের সরু নল-পথ দিয়ে যত বেগে গ্যাস বেরিয়ে

আসে ঠিক তত বেগে তা পেছনে চাপ বা ধাক্কা দেয় এবং তাতেই রকেট তীব্র বেগে ছুটে যায় উঁচুতে। তারপর, এক কুঠুরীর জ্বালানী শেষ হয়ে গেলে সেটি মূল যানের অংশ থেকে খসে যায়, তখন জ্বলে ওঠে পরের কুঠুরীর জ্বালানী। এই ভাবে কুঠুরীর পর কুঠুরী জ্বলে জ্বলে, গিয়ে পেঁছিয় মহাকাশে।

এই প্রক্রিয়ায় সুদূর মহাকাশে যাওয়ার প্রথম সন্ধান দেন রাশিয়ার কনস্তান্তিক সিওলকভস্কি। তিনি ছিলেন ১৯শ শতাব্দীর অখ্যাত দরিদ্র এক শিক্ষক মাত্র। আপন অধ্যবসায় ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা তিনি এই বহু কুঠুরী-বিশিষ্ট রকেট এবং তাতে তরল জ্বালানী ব্যবহার দ্বারা মহাকাশ অভিযানের পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। দুঃখের বিষয়, জারের আমলে তাঁর পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়ার সুযোগ তিনি পাননি। পরে ১৯২৬ সালে রবার্ট এইচ. গডার্ড নামে এক আমেরিকান বিজ্ঞানী তরল জ্বালানীর সাহায্যে রকেট উৎক্ষেপণ করে সাফল্য লাভ করেন।

এই সব ছোট ছোট সীমাবদ্ধ সাফল্য ও পরীক্ষিত গবেষণার পূর্ণ সফলতা ঘটলো বর্তমান শতাব্দীর মাঝামাঝি এসে। মহাকাশে শুধু যান পাঠানোই নয়—তাকে মর্ত্যের ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণে চালিত করা ও ফিরিয়ে আনার কৌশল বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের এক অসাধ্য সাধনা! ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর সোভিয়েট রাশিয়ার বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌রা মহাকাশে পাঠালেন স্পুটনিক-১। এক মাস পরেই তরা নভেম্বর ছুটলো আবার স্পুটনিক-২। দ্বিতীয় রকেটে শুধু মহাকাশ-গবেষণার যন্ত্রপাতিই ছিল না, লাইকা নামে একটি কুকুরও ছিল তার যাত্রী। স্পুটনিক-২ বহুবার ভূ-প্রদক্ষিণ করে পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ-ঘাঁটির নির্দেশে মহাকাশের নানা খবর নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে এল প্রায় সাড়ে পাঁচমাস পরে। সে সব খবরের মধ্যে একটা খবর আমাদের বহুদিনের ভুল একটা ধারণা ভেঙে দিল : পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মত নয়—ন্যাসপাতির মত। সেবারের যাত্রায় শুধু লাইকা আর জীবন্ত ফিরতে পারেনি।

পরবর্তী তিন বছর নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর মহাকাশে মানুষ পাঠানো সম্ভব হল। ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল বিশ্ববাসী সবিস্ময়ে শুনল—রাশিয়া মহাকাশে পাঠিয়েছে মানুষ : বর্তমান শতাব্দীর তিনি প্রথম মহাকাশচারী—ইউরি গ্যাগ্যারিন। রোমাঞ্চকর তাঁর মহাকাশের অভিজ্ঞতা। মহাকাশে ঠেলে ওঠার সময় তাঁর মনে হলো—তিনি যেন তাঁর আসনে পিষে যাচ্ছেন ; কারণ পৃথিবীর আকর্ষণ তাঁকে টানছে

নীচের দিকে আর তাঁর যান সে টান কাটিয়ে মহাবেগে উঠেছে উপরের দিকে। আবার পৃথিবীর সমান্তরাল কক্ষে পেঁৗছে হয়ে গেলেন একেবারে ভারশূন্য। তাঁর খাতা পেন্সিল জলের গ্লাস শূন্যে ভাসতে লাগল। ভূ-প্রদক্ষিণের সময় দেখলেন—ঘোর অন্ধকার মহাকাশের রূপ, দিনের বেলা প্রখর সূর্য থাকা সত্ত্বেও নিষ্কম্প নক্ষত্রগুলি জ্বলছে জ্বল জ্বল করে। পৃথিবীতে নেমে আসবার সময়ে দেখলেন ঘন বায়ুর সংঘর্ষে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছে তাঁর যানের বাইরের অংশে ; যানের ভেতরের তাপমাত্রা বিস্ময়কর যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণে অবশ্য স্বাভাবিকই ছিল। এর পরে রাশিয়ার দ্বিতীয় অভিযাত্রী তিতভ।

মহাকাশ পরিক্রমায় এবার মানুষের পালা। ১৯৬১ সালে আমেরিকার প্রথম মহাকাশ যাত্রী এলান শেপার্ড। ওই বছরই দ্বিতীয় অভিযাত্রী গেলেন ভার্জিল গ্রিসম। তারপর রাশিয়া ও আমেরিকার বহু অভিযাত্রী একের পর এক, কখনো দুই, কখনো তিন জনও একত্রে অভিযান করেছেন। এঁদের মধ্যে রাশিয়ার একজন মহিলাও ছিলেন—তাঁর নাম ভ্যালেন্তিনা তেরেশকোভা।

পরবর্তী পর্যায়ে নূতনতর অভিযানের প্রস্তুতি শুরু হল। এবার লক্ষ্য পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ।

১৯৬৮ সালের ২১শে ডিসেম্বর অ্যাপেলো-৮ নামে এক অতিকায় মহাকাশযান আমেরিকার কেপ কেনেডি থেকে দুঃসাহসিক এই অভিযান শুরু করল চাঁদের দিকে। অভিযাত্রী তিনজন—ফ্রাঙ্ক বোরম্যান, উইলিয়াম এন্ডারস্ ও জেমস্ লোভেল। ২৪শে ডিসেম্বর পেঁৗছে গেলেন চাঁদের আকাশে—শুরু হলো চন্দ্র-প্রদক্ষিণ। এই অভিযান কালে দু'জন যখন ঘুমোতেন, একজন থাকতেন জেগে—কিন্তু চন্দ্র প্রদক্ষিণের সময় তিন জনেই জেগে দেখেছেন অদ্ভুত সব দৃশ্য ঃ সূর্যকে দেখেছেন অতি শুভ্র একটা চাক্‌তির মত, চাঁদের আকাশ থেকে পৃথিবীকে দেখেছেন চাঁদের মত—তবে পৃথ্বী-চাঁদ যেন আরও বেশী উজ্জ্বল ও অনেক বড়। আর এমন যে আমাদের পরিচিত সুন্দর চাঁদ তাকে দেখতে মোটেই কিন্তু সুশ্রী নয়—শুধু ধূসর বর্ণের নুড়িতে ভরা এবড়ো-খেবড়ো, চারদিকে বড় বড় গহ্বর আর ফাটল। এই অভিযানে চাঁদে নামা সম্ভব হয়নি, তখনো বাকি ছিল অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। পরবর্তী আরও একটি অভিযানে, দুই অভিযাত্রী স্ট্যাফোর্ড ও সারনান খুঁটিনাটি সব পর্যবেক্ষণ করে এলেন, দেখে এলেন চাঁদে সব অবতরণযোগ্য স্থান। চাঁদে এবার মানুষ পাঠাবার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হলো।

১৯৬৯ সালের ১৬ই জুলাই মহাশক্তিমান স্যাটার্ন-৫ রকেটটি অ্যাপোলো-১১ কে নিয়ে ঊর্ধ্বাকাশে উঠে গেল তিন অভিযাত্রীকে নিয়ে—আলড্রিন, আর্মস্ট্রং ও কলিন্স। ২০শে জুলাই ওঁরা চাঁদের আকাশে পেঁছে গেলেন। ঐদিন মধ্যরাত্রে মূল যান থেকে 'ঈগল' নামে ছোট একটি চান্দ্রযানকে আলাদা করে নিয়ে আলড্রিন ও আমস্ট্রং পাড়ি দিলেন চাঁদের মাটিতে। এই প্রথম পদপাত ঘটলো মানুষের—মর্ত্যের মানুষের মহাকাশ অভিযানের সর্বোত্তম বিজয়। রাত তখন ১টা ৪৪ মিনিট। এই সাফল্যে তিনজন দুঃসাহসী অভিযাত্রীই শুধু ধন্যবাদের পাত্র নন। এই অভিযান প্রস্তুতির জন্য নিরলসভাবে কাজ করেছিলেন সাড়ে ন' হাজারেরও বেশী বিজ্ঞানী, কর্মী—আজ তাঁরাও পরম শ্রদ্ধায় স্মরণীয়।

ঘন্টা দুইয়ের মতো অভিযাত্রীরা চাঁদের মাটিতে কাটান। কুড়োলেন অনেক পাথরের নুড়ি। কাঠ কয়লার গুঁড়োর মতো মাটির রং। অদূরে একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছিল—তবে তার দূরত্ব এক মাইল কি আধ মাইল, অনুমান করতে পারলেন না। চন্দ্রপৃষ্ঠে ছায়াময় অংশগুলিতে এত গাঢ় অন্ধকার যে, নিজেরা কোথায় পা ফেলছেন তাও দেখতে পাচ্ছিলেন না। ঘন্টা দুই কাটিয়ে ওঁরা আবার পাড়ি দিলেন 'ঈগলে'। চাঁদের পিঠে রেখে এলেন একটি স্মারক ফলক। তাতে লেখা ছিলঃ "১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে পৃথিবী গ্রহ থেকে মানুষ এসে এখানে পদার্পণ করেছিল। আমরা এসেছিলাম মানবজাতির শান্তি কামনায়।"

কিন্তু এ প্রতিশ্রুতি আজ দুনিয়ার লোভী যুদ্ধবাজদের দুরভিসন্ধিতে প্রহসনে পর্যবসিত হতে চলেছে। আমেরিকা থেকে অ্যাটম বোমা ও তারকা-যুদ্ধের হুংকার, প্রস্তুতি শোনা যায়। বেশি দিনের কথা নয়, ওই দেশেরই এক অভিযাত্রী মহাকাশ থেকে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ কন্ঠে বলেছিল, কি সুন্দর আমাদের পৃথিবী! সমগ্র সৌরলোকের গ্রহ-উপগ্রহে এমন রূপ আর কোথাও নাই। সত্যিই তো, কবির ভাষায় গাঢ়নীল মেখলা বেষ্টিত শ্যামলে হলুদে রক্তিমে রজতবর্ণে আমাদের অন্নপূর্ণা ধনধান্যে পুষ্পে ভরা জীবধাত্রী বসুন্ধরা—রূপে রাজ-রাজেশ্বরী। সে কি অনাগত তারকা যুদ্ধে কয়েকটা উন্মাদের হাতে ধ্বংস হয়ে চাঁদের মাটির মত হয়ে যাবে!

[**সংকলক রচিত**]

অনুশীলনী

পাঠ-সংকেত ঃ বেলুনের যুগে আকাশে মানুষের সীমাবদ্ধ অভিযান—এবং পরে মহাকাশ জয়ে রকেটের পরিকল্পনা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রকেটের ধ্বংসাত্মক ভূমিকা কিন্তু পরে তার সৃষ্টিশীল ভূমিকা। মহাকাশ অভিযানের প্রথম ধাপে মনুষ্যহীন যান, দ্বিতীয় ধাপে জীবজন্তু, তৃতীয় ধাপে মানুষ।

[ক] **মৌখিক প্রশ্ন ঃ**

১। ভি-২ কি বস্তু ?

২। নকল উপগ্রহ কোন্ দেশ প্রথম আকাশে পাঠায় ? ওটির নাম কি ছিল ?

৩। গডার্ডের আগে তরল জ্বালানির ব্যবহার কে আবিষ্কার করেন ?

৪। ইউরি গ্যাগারিন কে ?

৫। চাঁদের মাটিতে পা দিয়েছেন কোন্ কোন্ অভিযাত্রী ?

[খ] **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

১। 'তার ওপরে বায়ু এত হাল্কা···থাকতে পারে না।' কোন্ প্রসঙ্গে একথা বলা হইতেছে ? কাহার উপরে হাল্কা বায়ুর কথা বলা হইতেছে ? বেলুনে কি করা হইত ? ঊর্ধ্বে কতটা পর্যন্ত যাইতে পারিত ?

২। 'কিন্তু মানুষের বিজ্ঞান সাধনার পরিণাম কি এই ধ্বংস!'—কোন্ প্রসঙ্গে একথা বলা হইয়াছে ? কি ধ্বংস ? কাহার দ্বারা ধ্বংস সাধিত হইয়াছিল ? পরিণামে কি হইল ?

৩। 'তবু আমাদের প্রায়···বোঝা যেতে পারে।' কি ভাবে বোঝা যাইতে পারে ? কি সাদৃশ্য আছে ? পার্থক্যই বা কি ?

৪। 'এই নিয়মেই—নীচের দিকে ঝাপ্‌টা মেরে পাখী শূন্যে উড়ে যায়।' কোন্ নিয়ম—নিজের ভাষায় বুঝাও।

৫। 'সে খবরের মধ্যে একটা···একটা ধারণা ভেঙে দিল।'—কে ভুল ভাঙিয়া দিল ? ভুলটা কি ছিল ?

৬। মহাকাশে প্রথম মহিলা অভিযাত্রীর নাম কি ?

৭। চন্দ্র অভিযানে কাহারা প্রথম চাঁদের মাটিতে পা রাখেন ?

[গ] **রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

১। 'সেবারের যাত্রায় শুধু লাইকা আর জীবন্ত ফিরতে পারেনি।' এই অভিযানের বিবরণ সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লেখ।

২। 'রোমাঞ্চকর তাঁর মহাকাশের অভিজ্ঞতা।' কাহার, কি অভিজ্ঞতা, সংক্ষেপে বিবৃত কর।

৩। চাঁদের আকাশে প্রথম অভিযানের বর্ণনা ও অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা কর।

৪। 'আমরা এসেছিলাম মানব জাতির শান্তি কামনায়।' এ কথা কাহার? এ প্রতিশ্রুতির ভবিষ্যৎ কি অনুমান কর?

৫। 'ঘণ্টা দুয়ের মত ওঁরা চাঁদের মাটিতে কাটান।'—কাহারা কাটান? তাঁহারা কি করিলেন এবং দেখিলেন?

[ঘ] ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ

১। 'অজানাকে জানবার···এক সাধনা।' তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

২। 'তাঁর খাতা পেন্সিল জলের গ্লাস শূন্যে ভাসতে লাগল।' ব্যাখ্যা করিয়া ইহার কারণ বুঝাইয়া দাও।

৩। 'রূপে রাজরাজেশ্বরী!' প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর।

[ঙ] ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ

১। শব্দার্থ লেখ ঃ নিয়ন্ত্রণ, প্রযুক্তিবিদ্যা, সমান্তরাল, পরিক্রমা।

২। দ্বিতীয় সারি হইতে প্রথম সারির বাক্য সম্পূর্ণ কর ঃ

(ক) কিন্তু মানুষের বিজ্ঞান-সাধনার ওই যুদ্ধের দশ বছর পরে	···	প্রযুক্তি বিদ্যার জয়ধ্বনি।
(খ) বিশ্ববাসী সবিস্ময়ে দেখল	···	পরিণাম কি এই ধ্বংস।
(গ) বিশ্বে উঠল বিজ্ঞান ও	···	'রকেটে'র নূতন ভূমিকা।

৩। ভুল থাকিলে সংশোধন কর ঃ

—১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর আমেরিকার বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা মহাকাশে পাঠালেন স্পুটনিক-২।

—ভূ-প্রদক্ষিণের সময় দেখলেন—ঘোর অন্ধকার পৃথিবীর রূপ, দিনের বেলা প্রখর সূর্য থাকা সত্ত্বেও কম্পমান নক্ষত্রগুলি জ্বলজ্বল করে।

—এঁদের মধ্যে ইংল্যান্ডের একজন মহিলাও ছিলেন—তাঁর নাম ভ্যালেন্তিনা তেরেশকোভা।

—ওই দিন মধ্যরাতে আলড্রিন / জেমস লোভেল / ফ্রাঙ্ক বোরম্যান / আর্মস্ট্রং পাড়ি দিলেন চাঁদের মাটিতে।

৪। টীকা রচনা কর ঃ

কনস্তান্তিক সিওলকভস্কি, রবার্ট এইচ. গডার্ড, নিউটনের গতিসূত্র, স্যাটার্ন-৫, ঈগল।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারত

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী



এশিয়াটিক সোসাইটির স্থাপনকাল হইতে ইউরোপের লোকে আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষের আলোচনা আরম্ভ করেন। আমরা আমাদের অতীতের গুণগৌরবে এত মুগ্ধ যে, সেকালে কি ছিল কি না ছিল, অনুসন্ধানের প্রয়োজন দেখি না। তবে ইংরেজ লেখকের তর্জমা হইতে দুই চারিটা বাক্য সংকলন করিয়া তাণ্ডব নৃত্যে ব্রহ্মাণ্ড কম্পমান করিবার ক্ষমতা আমাদের প্রভূত পরিমাণে রহিয়াছে সংশয় নাই। যাহা হউক, আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষ কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল এ সম্বন্ধে দুই চারিটা স্থূল কথা বিবৃত করাই এখানে উদ্দেশ্য।

প্রথম, পৃথিবীর আকার। জ্যোতিষশাস্ত্রে পৃথিবীর গোলত্ব

অতি প্রাচীন কালেই স্বীকৃত হইয়াছিল। গোলত্ব প্রমাণের জন্য যে সকল যুক্তি আজকাল প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তখনও ঠিক সেই সেই যুক্তি প্রদত্ত হইত। যথা, পৃথিবী গোল না হইলে দৃষ্টিপ্রতিষেধক ক্ষিতিজরেখা (Horizon) সর্বত্র বৃত্তাকার হইত না; গোল না হইলে উত্তরমুখে গমন কালে উত্তরস্থ তারকাগণের ক্রমশঃ উন্নতি লক্ষিত হইত না; গোল না হইলে চন্দ্রগ্রহণকালে দৃষ্ট পৃথিবীর ছায়া বৃত্তাকার হইত না; ইত্যাদি।

ভূগোলপৃষ্ঠ বিবিধ কল্পিত রেখা দ্বারা বিভক্ত হইত। অবস্থিতি, দূরত্ব নির্দেশ, উদয়াস্তগমনকালের অন্তর, দিবারাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি ইত্যাদি বুঝাইবার জন্য এইরূপ রেখার কল্পনা এক্ষণে আবশ্যক হয়, তখনও আবশ্যক হইত।

এক্ষণে আমরা জানি, ভূমণ্ডল সম্পূর্ণ বর্তুলাকার নহে, মেরুপ্রদেশে 'কিঞ্চিৎ চাপা'। ইহার প্রমাণ, নিরক্ষপ্রদেশের নিকটে দশ মাইল বা দশ যোজন পথ উত্তরমুখে চলিলে ধ্রুবতারা যতখানি উন্নত হয়, মেরুপ্রদেশে ধ্রুবতারা ঠিক ততখানি উন্নত হয় না। দ্বিতীয়, নিরক্ষপ্রদেশে একালের পেন্ডুলম বা পরিদোলক যন্ত্র এক মিনিটে যতবার দোলে, মেরুপ্রদেশে পেন্ডুলম তাহার অপেক্ষা কিছু অধিকবার দোলে। সেকালে পেন্ডুলমের ব্যবহার ছিল না এবং স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশে গিয়া ধ্রুবতারার উন্নতি দেখিবারও সুবিধা ছিল না। সুতরাং ভূমণ্ডল ঠিক বর্তুলাকার বলিয়াই গৃহীত হইত।

তারপর পৃথিবীর আয়তন। অক্ষাংশ নিরূপিত হইলে পৃথিবীর পরিধি কত মাইল, কি কত যোজন, তাহা আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। একালেও যে উপায়, সেকালেও সেই উপায়। আর্যভটের* গণনায় পৃথিবীর পরিধি ৩,৩০০ যোজন; এক যোজনে চারি ক্রোশ ও দশ ক্রোশে উনিশ মাইল, এই হিসাবে আর্যভটের মতে ভূপরিধি ২৫,০৮৫ মাইল। একালের গণনায় পরিধি ২৪,৯০০ মাইল।

ইংরেজরা গ্রীনউইচ নগরের মধ্য দিয়া ভূগোলের মধ্যরেখা কল্পনা করেন। সেকালে মধ্যরেখা উজ্জয়িনী নগর ভেদ করিয়া কল্পনা করা হইত।

তারপর পৃথিবীর গতি। আজকাল অবশ্য স্কুলের বালকমাত্রকেই জিজ্ঞাসা করিলে সে পৃথিবীর দৈনিক ও বার্ষিক গতির কথা এক নিঃশ্বাসে উল্লেখ করিবে। তবে উভয় গতির পক্ষে প্রমাণ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাওয়া কিছু কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। আমাদের বোধ হয়,

* আর্যভট ৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে আবির্ভূত হন।

যেন সমুদয় নক্ষত্রচক্র প্রত্যহ পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে; পৃথিবী যেন সেই নক্ষত্রচক্রের কেন্দ্রগত। কিন্তু পৃথিবী ঘুরিতেছে—নক্ষত্রচক্র ঠিক আছে, কি নক্ষত্রচক্র ঘুরিতেছে ও পৃথিবী স্হির আছে, ইহা লইয়া বিতণ্ডা একালেও যেমন চলিয়াছিল, সেকালেও তেমনি চলিয়াছিল। পৃথিবীর আহ্নিকগতির প্রবল প্রমাণ একালের ফুকো সাহেবের উদ্ভাবিত পেন্ডুলম। কিন্তু সেকালে, যখন বলবিজ্ঞানের অংকুরোদ্গম হয় নাই, তখন এ প্রমাণ প্রয়োগের অবকাশ ছিল না। আর্যভট তীক্ষ্ণদৃষ্টিবলে বলিয়াছিলেন, পৃথিবীই ঘুরিতেছে।

গ্রহগণের গতি অতি জটিল ও বিচিত্র। গ্রহগণের অবস্হিতির ও গতির গণনাই যখন জ্যোতিষশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য তখন এই জটিলতা বিচ্ছিন্ন করিয়া ফল বাহির করিতে পারিলেই জ্যোতির্বিদ্যা সার্থক হয়। সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বে একদিন এই জটিলতা মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি শুভ্র আলোকবর্তিকা হস্তে করিয়া নিবিড় তিমির ভেদ করেন—তাঁহার নাম নিকলাস কোপর্নিকস।*

যদি ধরা যায়, নক্ষত্রচক্র স্হির আছে এবং সূর্য স্হির আছে, এবং বুধ, শুক্র, পরে পৃথিবী ও পরে মঙ্গলাদি গ্রহ সূর্যকে কেন্দ্রে রাখিয়া নির্দিষ্ট কক্ষে ভ্রমণ করিতেছে, তাহা হইলে গ্রহগণের আকাশ ভ্রমণের যত কিছু জটিলতা, সমুদয় একেবারে দূরীভূত হইয়া যায়। এবং কোন্ গ্রহ কোন্ সময়ে কোন্ স্হানে থাকিবে, সে গণনা অবোধ বালকেরও আয়ত্ত হইয়া উঠে। কোপর্নিকস পৃথিবীর ও গ্রহগণের এই সূর্যকেন্দ্রক গতির আবিষ্কর্তা।

আমাদের আর্যভট পৃথিবীর দৈনিক গতির আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু পৃথিবীর বার্ষিক সূর্যকেন্দ্রক গতির সম্বন্ধে তিনি কিছু বলিয়াছিলেন, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

তবে এই পর্যন্ত বলা যায়, পূর্বে এ দেশে যে প্রণালীতে গ্রহগণের অবস্হিতি গণিত হইত এবং এত জটিলতা সত্ত্বেও যেরূপ সূক্ষ্মভাবে ফল নিষ্কাশিত হইত, তাহাতে বিলক্ষণ বাহাদুরি ও ওস্তাদি আছে।

মেরুস্হলে ছয় মাস দিন, ছয়মাস রাত্রি—কেবল আমরাই জানি, আর প্রাচীনেরা জানিতেন না, এরূপ নহে। কোন্ স্হানে কোন্ সময়ে দিবারাত্রির পরিমাণ কত হইবে, তাহা সেকালে ত্রিকোণমিতি প্রয়োগে নিরূপিত হইত। জ্যোতিষিক গণনার জন্য সেকালে ত্রিকোণমিতির

* আবির্ভাব কাল ১৪৭৩-১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দ

সৃষ্টি ও চর্চা আবশ্যক হইয়াছিল। ভাস্করাচার্য* প্রণীত প্রাচীন গ্রন্থে কোণ গণনার যে হিসাব দেওয়া আছে তাহা ধরিয়া গণনা করিলে অধিক ভুল হয় না।

ইংরেজী মতে পঞ্জিকা গণনা অপেক্ষা আমাদের প্রাচীন মতের গণনা সমধিক যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত। প্রথম কথা, বৎসরে প্রায় ৩৬৫¼ দিন ; কিন্তু বাধ্য হইয়া সকলকেই ৩৬৫ দিনে ব্যবহারিক বৎসর ধরিতে হয়। এ জন্য যে ভুল ঘটে, ইংরেজী পঞ্জিকায় চারি বৎসর অন্তর একদিন (লিপইয়ার) যোগ করিয়া সংশোধিত হইয়া থাকে। আমাদের পঞ্জিকায় বৎসর বৎসর সঙ্গে সঙ্গে সংশোধনের ব্যবহার আছে।

* আবির্ভাব ১১শ খ্রীষ্টাব্দ। বিখ্যাত গ্রন্থ 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি।'

অনুশীলনী

পাঠ-সংকেত : বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের পন্ডিতেরা যে কতখানি অগ্রসর হইয়াছিলেন—আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহার বর্তমান রচনার অংশে তাহা বিবৃত করিয়াছেন। পৃথিবীর আকার, আয়তন, গতি ও গ্রহগণের অবস্থান বিষয়ে প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অবদান স্মরণীয়। বিশেষ করিয়া জ্যোতির্বিজ্ঞানে আর্যভট এবং ত্রিকোণমিতি চর্চায় ভাস্করাচার্যের অবদান আমাদের জাতীয় গৌরবের বিষয়। কিন্তু ইংরাজ-রাজের প্রভুত্বকালে তাহাদের নিজ-জাতির জয়-গাথাই ঘোষিত হইত —ভারতের অবদান স্বীকৃত হইত না বা ঘোষিত হইত না

[ক] **মৌখিক প্রশ্ন :**

১। এই নিবন্ধের রচয়িতা কে? তাঁহার সম্বন্ধে কি জান?
২। গ্রীনউইচ কোথায়? উজ্জয়িনী কোথায়?
৩। পেন্ডুলম কি বস্তু? ইহার বাংলা কি?
৪। আর্যভটের আবিষ্কার কি?
৫। ভাস্করাচার্যের আবিষ্কার কি?

[খ] **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :**

১। 'গোলকত্ব প্রমাণের জন্য······সেই সেই যুক্তি প্রদত্ত হইত।'—এখানে যে দুই কালের কথা বলা হইয়াছে, সে কোন্ কোন্ কাল? যুক্তিগুলি কি?
২। 'ভূগোল পৃষ্ঠ বিবিধ কল্পিত রেখার দ্বারা বিভক্ত হইত।'—ইহা কোন কালে হইত? এখন কি হয়? ইহা কেন হইত? ইহার দ্বারা কি বুঝা যায়?

৩। আর্যভটের গণনায় পৃথিবীর পরিধি কত? একালেই বা কত? ইহার দ্বারা প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞানীর সম্পর্কে তোমার ধারণা কিরূপ দাঁড়ায়?

৪। 'কিন্তু পৃথিবীর বার্ষিক···পাওয়া যায় না।'—কাহার সম্বন্ধে এ মন্তব্য? তিনি কি আবিষ্কার করিয়াছিলেন?

৫। 'যে ব্যক্তি শুভ্র···ভেদ করেন।'—তিনি কে? কোন্ তিমির ভেদ করেন? তিনি কি আবিষ্কার করেন? তাঁহার পূর্বে এ বিষয়ে আর কোনো আবিষ্কারকের নাম মনে পড়ে কি?

৬। 'ইংরেজী মতে···বিজ্ঞানসম্মত।' বিশেষ কোন প্রসঙ্গে এ মন্তব্য? আমাদের গণনা কি বিজ্ঞানসম্মত মনে কর? যুক্তি দেখাও।

৭। একালে প্রাচীন জ্যোতিষের আলোচনা কবে হইতে শুরু হয়?

[গ] **রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

১। পৃথিবীর গোলত্ব প্রমাণের জন্য সেকাল ও একালের যুক্তিগত কোনো পার্থক্য আছে কি?—সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২। 'সেকালে ভূমন্ডল ঠিক বর্তুলাকার বলিয়াই গৃহীত হইত।' এই ধারণা সঠিক কি? এ বিষয়ে এ কালের ধারণা কি কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে? উক্ত দুটি ধারণার মধ্যে যদি পার্থক্য দেখ, তবে কেন এই পার্থক্য ঘটে. বুঝাইয়া দাও।

৩। পেন্ডুলম কে আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারে জ্যোতির্বিজ্ঞানের কি উপকার সাধিত হয়? আবিষ্কারক সম্বন্ধে কি জান?

৪। নিকোলাস কোপার্নিকসের অবদান সম্পর্কে যাহা জান, লেখ। তিনি কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন?

[ঘ] **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ**

১। 'আমরা আমাদের অতীতের···প্রয়োজন দেখি না।' প্রসঙ্গ উল্লেখ পূর্বক ব্যাখ্যা কর।

২। 'প্রাচীনেরা অসীম পরিশ্রমে···সমীপবর্তী হইয়াছিলেন।' অতি সংক্ষেপে প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা লিখ।

[ঙ] **স্মৃতিপরিমাপক প্রশ্ন ঃ**

১। ভুল সংশোধন কর ঃ

(ক) গোল না হইলে উত্তর মুখে গমনকালে উত্তরস্থ তারকাগণের ক্রমশঃ অবনতি লক্ষিত হইত না।

(খ) পৃথিবী গোল না হইলে দৃষ্টিপ্রতিষেধক ক্ষিতিজরেখা (দিগন্ত রেখা) সর্বত্র আবছা হইত না।

(গ) ইংরেজি মতে পঞ্জিকা গণনা অপেক্ষা আমাদের প্রাচীন মতের গণনা অবৈজ্ঞানিক ও অযথার্থ।

২। শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ

(ক) নিরক্ষপ্রদেশের নিকটে দশ মাইল পথ চলিলে…ধ্রুবতারা যতখানি …হয়, মেরু প্রদেশে…ঠিক ততখানি… হয় না।

(খ) আর্যভটের মতে ভূপরিধি…মাইল। একালের গণনায় পরিধি… মাইল।

(গ) ইংরেজরা · নগরের মধ্য দিয়া ভূগোলের মধ্যরেখা কল্পনা করেন। সেকালে মধ্যরেখা…নগর ভেদ করিয়া কল্পনা করা হইত।

[চ] **ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ**

(ক) অর্থ লিখ ঃ দৃষ্টিপ্রতিষেধক, ক্ষিতিজরেখা, বৃত্তাকার, বলবিজ্ঞান, অংকুরোদ্গম, লিপইয়ার।

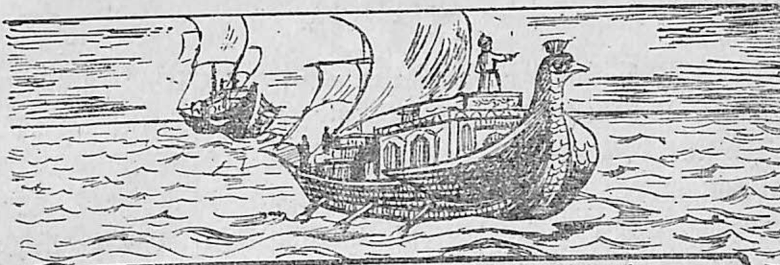
(খ) টীকা লিখ ঃ নিরক্ষপ্রদেশ, ধ্রুবতারা, পরিদোলক যন্ত্র, অক্ষাংশ, গ্রীনউইচ, আর্যভট, ভাস্করাচার্য, কোপার্নিকস, ফুকো সাহেব।

(গ) ইংরাজি শব্দ এই নিবন্ধে কয়টি ব্যবহৃত হইয়াছে খুঁজিয়া বাহির কর ও উহাদের বাংলা অর্থ দাও।

(ঘ) সেকাল ও একালের আবিষ্কার সম্বন্ধে ও উহার পার্থক্যসূচক একটি চার্ট বা সারণী তৈরী কর।

(ঙ) পাঠ্য অনুসরণে দ্বিতীয় সারি হইতে প্রথম সারির বাক্য সম্পূর্ণ কর ঃ

মেরু প্রদেশে পেন্ডুলম	…	ততখানি উন্নত হয় না।
পৃথিবী যেন	…	ফুকো সাহেবের উদ্ভাবিত পেন্ডুলম।
মেরু প্রদেশে ধ্রুবতারা ঠিক	…	তাহার অপেক্ষা কিছু অধিকবার দোলে।
পৃথিবীর আহ্নিক গতির প্রবল প্রমাণ	…	সেই নক্ষত্রচক্রের কেন্দ্রগত।



প্রাচীন কৃষি ও শিল্পের গৌরব

নীহাররঞ্জন রায়



বাংলার শিল্পজাত দ্রব্যাদির কথা বলিতে গিয়া প্রথমেই বলিতে হয় বস্ত্র-শিল্পের কথা। বাংলা-দেশের বস্ত্রশিল্পের খ্যাতি খ্রীষ্টের জন্মের বহু পূর্বেই দেশে বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, এবং ইহাই যে এ-দেশের প্রধানশিল্প ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, আরব, চীন ও ইতালীয় পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের বৃত্তান্তের মধ্যে। প্রাচীন বাংলার এই সম্পদের কথা গ্রীক ঐতিহাসিকেরা বার বার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

সমুদ্রতীরবর্তী গঙ্গা-বিধৌত দেশ বাংলা দেশ।

৩। ধাতু শিল্পের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বাঙালীর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়? ব্যক্তির বিবৃতি, বা কোন্ কোন্ গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে?

৪। 'খ্রীষ্টীয় প্রথম……গ্রন্থে বলিতেছেন'—এই প্লিনি কে? তাঁহার গ্রন্থের নাম কি? তিনি কি বলিয়া গিয়াছেন?

[গ] রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :

১। 'গঙ্গারিডি' দেশের অবস্থান নির্ণয় করিয়া সেখান হইতে কোন্ কোন্ দ্রব্য কোন্ কোন্ দেশে রপ্তানি হইত, বিবরণ দাও।

২। দেশের ধনোৎপাদনের উৎস কি? প্রাচীন বাংলায় তাহা কিরূপ ছিল, নিজের ভাষায় তাহার বিবরণ দাও।

৩। 'সকল শিল্পের মধ্যে………স্থান নিশ্চয়ই ছিল।' বিশেষ স্থানটি কি, তাহার তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও।

[ঘ] ব্যাকরণগত প্রশ্ন :

১। শব্দার্থ লেখ : পিপ্পলি, দ্যুতিময়, গুবাক।

২। পদপরিবর্তন কর : গাঙ্গেয়, পর্যটক, উৎপন্ন, পালিত, বহন।

৩। শূন্যস্থান পূর্ণ কর : কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের…পাই, দক্ষিণ ভারতের …বাহিয়া বণিকেরা গুজরাট পর্যন্ত যে … সম্ভার লইয়া যাইতেন, তাহার মধ্যে গুবাক, পান ও … উল্লেখ আছে।

৪। ভুল থাকিলে সংশোধন কর : গুবাকের বদলে লইয়া আসিতেন শঙ্খ, মরকতের বদলে পান এবং নারিকেলের বদলে মাণিক্য।

৫। টীকা রচনা কর : কৌটিল্য, মার্কো-পোলো, মা-হুয়ান, মসলিন, চাও জু-কুয়া, অগ্নিপুরাণ, অঙ্গ-বঙ্গ, মুকুন্দরাম, ইন্ডিকা।

পদ্যাংশ



কালকেতু পশুরাজ যুদ্ধ

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম

প্রভাতে পরিয়া ধড়া শরাসনে দিয়া চড়া
খরতীক্ষ্ম লয় তিন বাণ।
মাথাতে জালের দড়ি কানে ফটিকের কড়ি
মহাবনে করিলা পয়াণ ॥
দূরে থাকি দেখে চর কহে সিংহ-বরাবর
কালকেতু ওই আসে বন।
শুনি কোপে জ্বলে অঙ্গ পথে আগুলিল সিংহ
দুইজনে করে মহারণ ॥
সিংহে বীরে মহারণ সচকিত পশুগণ
অবিরত দোঁহার গর্জনে।
সিংহে বলে নাহি টুটে অস্ত্র নাহি গায়ে ফুটে
ঝড় বহে নিঃশ্বাস-পবনে ॥
গগনে উঠিয়া লাফে বীরেরে কেশরী ঝাঁপে
হানিতে চাপড় চাহে বুকে।
উঠিয়া মহিষাচালে সিংহেরে হানিল ভালে
দারুন মুটকি মারে মুখে ॥
সিংহ তেজে বড় দড় বীরকে মারিল চড়
লাফ দিয়া উঠিল গগনে।

পড়িতে বীরের গায় ঢালে লুকাইল কায়
সিংহ রহে চাপিয়া চরণে ॥
পরাক্রমে নাহি টুটে কেশরী ঠেলিয়া উঠে
যেন ক্ষিতি হইতে তপন।
বীর অতি কোপে যুঝে ধরিল সিংহের লেজে
বিষধরে গরুড় যেমন ॥
লেজে ধরি দেয় পাক সিংহ যেন ঘোরে চাক
তথাপি সিংহের বড় বল।
তুলিয়া আছাড়ে ভুঞে শোণিত নিকলে মুয়ে
দুই অঙ্গে বহে ঘর্ম জল।

... ...

সিংহেরে ধরিয়া বলে পাঁজর ভাঙিল কিলে
কৃপা করি ছাড়ি দিল বীর।
সিংহ পলাইয়া যায় ঘন পাছু পানে চায়
ত্রাসে সিংহ পান করে নীর ॥

অনুশীলনী

পাঠ-সংকেত : আলোচ্য অংশটি কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের সুবিখ্যাত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য হইতে উদ্ধৃত। অরণ্যচারী ব্যাধ কালকেতু এ কাব্যের নায়ক, সে দেবতা নহে, এবং দেবোপমও সে নয়—মধ্যযুগের সাহিত্যে এই ব্যাধচরিত্র সৃষ্টি এক বিরল দৃষ্টান্ত। পশুরাজ সিংহের সহিত কালকেতুর লুকোচুরি শিকার-শিকারীর ব্যাপার নহে, মুকুন্দরাম এক মল্লযুদ্ধের কল্পনা করিয়া মহাবলবান পশুরাজের শক্তি অপেক্ষা মানুষ কালকেতুকে অধিকতম শক্তিমান করিয়া তুলিয়াছেন—যে মানুষ অরণ্যচারী হইলেও বন কাটিয়া বসত গড়ে, রাজ্য গড়ে, সমাজ গড়ে। সে ইতিবৃত্ত কালকেতু উপাখ্যানের পরবর্তী অধ্যায়।

[ক] **মৌখিক প্রশ্ন :**

(১) এই অংশটির রচয়িতা কে ? তাঁহার মূল কাব্যের নাম কি ?
(২) কবির কোন্ কালে আবির্ভাব ?

(৩) 'খরতীক্ষ্ন লয় তিন বাণ।'—পশুরাজ-কালকেতু যুদ্ধে এই বাণ কি কাজে লাগিয়াছিল?

[খ] সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

(১) 'মহাবনে করিলা পয়াণ।'—কে, কখন 'পয়াণ' করিল? কোথায় 'পয়াণ' করিল? তাহার সঙ্গে কি ছিল? তাহার সাজসজ্জা কিরূপ ছিল?

(২) 'শুনি কোপে জবলে অঙ্গ।"—কাহার কথা শুনিয়া, কাহার অঙ্গ জবলিয়া উঠিল? পরে কি হইল?

[গ] রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :

(১) কালকেতুর শিকারযাত্রা ও তাহার বেশবাস সম্পর্কে বর্ণনা দাও।

(২) কালকেতুর সহিত সিংহের মল্লযুদ্ধের বর্ণনা দাও।

(৩) কালকেতু-পশুরাজ যুদ্ধে কালকেতুর চরিত্র কি ভাবে রচিত হইয়াছে? সে কি হত্যাকারী ব্যাধ মাত্র, না যথার্থ বীরত্ব গুণে মণ্ডিত? কি ভাবে তাহা বুঝা যায়?

[ঘ] ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :

(১) 'যেন ক্ষিতি হইতে তপন।' এবং 'বিষধরে গরুড় যেমন।'—কবির এই ব্যঞ্জনার তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও। কোন্ প্রসঙ্গে এ কথা বলা হইয়াছে?

[ঙ] ব্যাকরণগত প্রশ্ন :

(১) শব্দার্থ লেখ : ধড়া, কোপ, দোঁহার, ঝাঁপে, মহিষাচালে, মুটকি, যুঝে, ত্রাসে, নীর।

(২) 'নিকলে' মানে কি? ইহা কোন্ ভাষার শব্দ?

(৩) সাধু গদ্যে পরিবর্তন কর : পয়াণ, আগুলিল, মুটকি, ভুঞ্জে।

(৪) গদ্যে রূপান্তরিত কর :
'দূরে থাকি দেখে চর······করে মহারণ।'



অন্নপূর্ণা দিলে শিবেরে অন্ন।
অন্ন খান শিব সুখসম্পন্ন ॥
সঘৃত পলান্নে পূরিয়া হাতা।
পরশেন হরে হরিষে মাতা ॥
পায়সপয়োধি সপসপিয়া।
পিষ্টক পর্বত কচমচিয়া ॥
লিহ লিহ জিহে লেহ্য লেহিয়া।
চুমুকে চক চক পেয় পিয়া ॥
চুকু চুকু চুকু চুষ্য চুষিয়া।
কচর মচর চর্ব চিবিয়া ॥
জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া।
নাচেন শংকর ভাবে ঢলিয়া ॥
সর সর সরে বাঘের ছাল।
দলমল দোলে মুন্ডের মাল ॥
ববম্ ববম্ বাজয়ে গাল।
ডিমি ডিমি বাজে ডমরু ভাল ॥
পঞ্চমুখে গেয়ে পঞ্চম তালে।
নাচেন শংকর বাজায়ে গালে ॥
নাটক দেখিয়া শিব ঠাকুর।
হাসেন অন্নদা মৃদু মধুর ॥

অনুশীলনী

পাঠ-সংকেত ঃ আলোচ্য কবিতাংশটি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের **'অন্নদামঙ্গল'** হইতে উৎকলিত ঃ ছন্দের বৈচিত্র্যে এবং চর্ব চোষ্য লেহ্য পেয় খাদ্যসামগ্রীর বিচিত্র শব্দময় ধ্বনির সন্নিবেশে অংশটি খুবই উপভোগ্য। কবির রচনাকৌশল উল্লেখ্য। প্রসঙ্গতঃ শিবে অন্নদানের পৌরাণিক উপাখ্যানটি বিবৃত করা উচিত।

[ক] **মৌখিক প্রশ্ন ঃ**

(১) 'শিবে অন্নদান' কাহার রচনা ? মূল কাব্যের নাম কি ?

(২) পৌরাণিক প্রসিদ্ধিতে শিবের কয়টি মুখ ?

(৩) পঞ্চম তাল কি ?

(৪) প্রথম দশ লাইন মুখস্থ বল।

[খ] **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

(১) 'জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া।
নাচেন শংকর ভাবে ঢলিয়া ॥'—শিব অন্নপূর্ণার জয়ধ্বনি কেন দিতেছেন ? কেন তিনি ভাবে ঢলিয়াছেন ? ইহার পৌরাণিক প্রসঙ্গ কি ?

(২) 'হাসেন অন্নদা মৃদুমধুর ॥'—কাহার কোন্ প্রসঙ্গে এ কথা ? অন্নদা কেন হাসিতেছেন ?

[গ] **রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

(১) শিবের বেশবাস কিরূপ চিত্রিত হইয়াছে, নিজের ভাষায় লেখ।

(২) শিবের ভোজন দৃশ্যটি নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

[ঘ] **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ**

(১) 'পঞ্চমুখে গেয়ে পঞ্চম তালে।
নাচেন শংকর বাজায়ে গালে ॥'—প্রসঙ্গ উল্লেখসহ ব্যাখ্যা কর।

(২) 'পায়সপয়োধি সপসপিয়া
পিষ্টক পর্বত কসমচিয়া।'—শিবের এই আহারের তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও।

[ঙ] **ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ**

(১) শব্দার্থ বল ঃ—পরশেন, লেহ্য, পঞ্চমুখে।

(২) সাধু গদ্যরূপ দাও ঃ পূরিয়া, হরিষে, সপসপিয়া, লেহিয়া, চিবিয়া।

(৩) ভুল সংশোধন কর ঃ পায়সপয়োধি পান করিয়া।
পিষ্টক পর্বত সপসপিয়া ॥
লিহ লিহ জিহে চুষ্য চুষিয়া।
চুমুকে চকচক লেহ্য লেহিয়া ॥
চুকু চুকু চুকু সপ্সপিয়া।
কচর মচর চর্ব চিবিয়া ॥



বন্দী সমুদ্রের প্রতি রাবণের ধিক্কার

— মধুসূদন দত্ত

রাবণ, ফিরায়ে আঁখি, দেখিলেন দূরে
সাগর—মকরালয়। মেঘশ্রেণী যেন
অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল, বাঁধা
দৃঢ় বাঁধে। দুই পাশে তরঙ্গ-নিশ্চয়,
ফেণাময়, ফণাময়যথা ফণিবর,
উথলিছে নিরন্তর গভীর নির্ঘোষে।
অপূর্ব-বন্ধন সেতু, রাজপথ-সম
প্রশস্ত, বহিছে জলস্রোতঃ কলরবে,
স্রোতঃপথে জল যথা বরিষার কালে।
অভিমানে মহামানী বীর কুলর্ষভ
রাবণ, কহিলা বলী সিন্ধুপানে চাহি ;—
"কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ! হা ধিক, ওহে জলদলপতি!
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য অজেয়
তুমি ? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর ? কোন্ গুণে, কহ, দেব, শুনি,
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে ?
প্রভঞ্জন বৈরী তুমি ; প্রভঞ্জন-সম

ভীম পরাক্রমে। কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন্ পাপে ? অধম ভালুকে
শৃংখলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে ;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে ? এই যে লংকা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামী,
কৌস্তভ-রতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দয় এবে তুমি এর প্রতি ?
উঠ, বলি বীরবলে এ জাঙ্গাল ভাঙ্গি,
দূর কর অপবাদ ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল-জলে এ প্রবল রিপু !
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।"

অনুশীলনী

পাঠ-সংকেত ঃ আলোচ্য পাঠ্য কবিতাংশটি মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ' কাব্য হইতে উৎকলিত। রামচন্দ্রের বাহিনী সাগরে সেতু বাঁধিয়া লঙ্কা অবরোধ করিয়াছে। সমুদ্রের এই বন্ধন-দশা দেখিয়া রাবণ মহাশক্তিশালী সাগরের উদ্দেশে ধিক্কার দিতেছেন। এই ধিক্কারের মধ্যে দাসত্বের প্রতি রাবণের যে ঘৃণা ও ক্রোধ ফুটিয়া উঠিয়াছে, অন্যদিকে তাঁহার স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও দেশাত্মবোধ, তাহা উল্লেখ্য। বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসের রামায়ণে রাবণের এ চরিত্র দেখি না—এ রাবণ মধুসূদনের নূতন সৃষ্টি।

[ক] মৌখিক প্রশ্ন ঃ

(১) কবিতাংশের রচয়িতা কে ? মূল মহাকাব্যের নাম কি ?

(২) আর কয়জন রামায়ণ রচয়িতার নাম জান ? কে কে ? তাঁহারা মধুসূদনের অগ্রবর্তী, না পরবর্তী ?

(৩) রাবণের উক্তি হইতে ১৫ লাইন মুখস্থ বল।

[খ] সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) 'কি সুন্দর মালা……পরিয়াছ গলে।'—বক্তা কে ? মালা কে পরিয়াছে ? ইহা কেমন মালা ?

(২) 'অধম ভালুকে……বাঁধে বীতংসে ?'—বক্তা কে ? 'যাদুকর' কাহাকে ইঙ্গিত করিতেছে ? ভালুক ও কেশরীর তুলনার অর্থ কি ?

(৩) 'কেন হে নির্দয় এবে তুমি এর প্রতি ?'—বক্তা কে ? কাহাকে নির্দয় বলা হইয়াছে ? কাহার প্রতি নির্দয় ? নির্দয়তার প্রমাণ কি ?

(৪) 'জুড়াও এ জ্বালা……এ প্রবল রিপু।'—বক্তা কে ? এ জ্বালার অর্থ কি ? প্রবল রিপু কে ?

[গ] রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

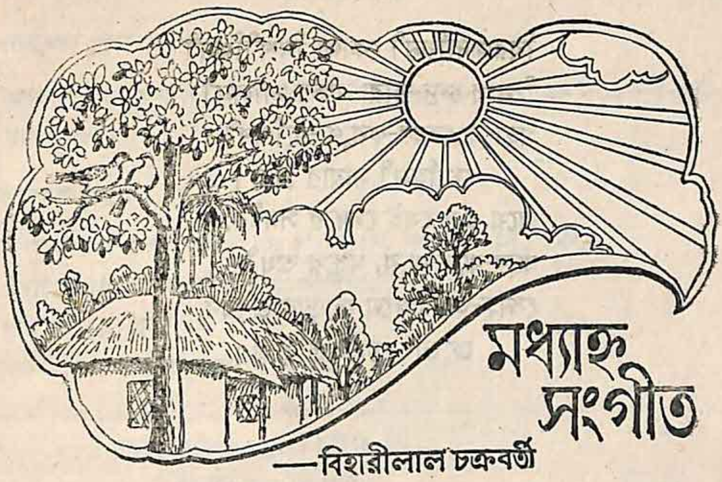
(১) সেতু ও সমুদ্রের কবি-কল্পিত চিত্রটি নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।
(২) সমুদ্রবক্ষে লংকার অবস্থানের চিত্রটি নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

[ঘ] ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ

(১) প্রসঙ্গ উল্লেখ পূর্বক ব্যাখ্যা কর ঃ
—'হায়, এই কি হে, তোমার ভূষণ,
রত্নাকর ?'
—'রেখো নাগো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা।'

[ঙ] ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ

(১) শব্দার্থ ঃ মকরালয়, কুলর্ষভ, প্রচেতঃ, কৌস্তভরত্ন।
(২) গদ্যান্তর কর ঃ
উঠ, বলি বীরবলে এ জাঙ্গলে ভাঙি,
দূর কর অপবাদ ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।



মধ্যাহ্ন সংগীত

—বিহারীলাল চক্রবর্তী

চরাচরব্যাপী অনন্ত আকাশে
প্রখর তপন ভায়,
দিগ্‌দিগন্ত উদাস মূরতি
উদার স্ফূরতি পায়।
নীরব মেদিনী, পাদপ নিঝুম
নতমুখ ফুল ফল,
নত-মুখী লতা নেতিয়ে পড়েছে
স্তব্ধ-সরসী-জল।
শান্ত সঞ্চরণ, শান্ত অরণ্যানী,
মূক বিহঙ্গম, মূঢ় পশু প্রাণী,
'ঘুঘুঘু—ঘুঘুঘু' কাতরা কপোতী
করুণ করিয়া গায়!
স্তব্ধ নগর, স্তব্ধ ভূধর,
স্তব্ধ হ'য়ে আছে উদার সাগর,
ধূ-ধূ মরুস্থলী, বিহ্বলা হরিণী
চমকি চমকি চায়।
স্তব্ধ ভুবন, স্তব্ধ গগন,
প্রাণের ভিতর করিছে কেমন,
তৃষায় কাতর, কঠোর মরুত
একটুও নাহি বায়!

বিরামদায়িনী কোথা নিশীথিনী
স্নিগ্ধ-চন্দ্র-তারা-নক্ষত্র-মালিনী
মহা-মহেশ্বর-করুণা-রূপিণী
মোহিনী মায়ার প্রায় !
লয়ে এস সেই মেদুর সমীর,
ঝুর-ঝুর-ঝুর, মধুর অধীর,
স্নেহ-আলিঙ্গনে জুড়াব জীবন,
জুড়াব তাপিত কায় !

অনুশীলনী

পাঠ-সংকেত ঃ কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীকে আধুনিক গীতিকবিতার জনক বলা হয়। ইনি রবীন্দ্রনাথের পূর্বসূরী। তাঁহার বিখ্যাত কাব্য 'সারদামঙ্গল' এই আত্মমগ্ন গীতিময়তার সুরে সুরময়। বর্তমান 'মধ্যাহ্ন সঙ্গীত' কবিতাটিতে নিদাঘ মধ্যাহ্নের শুধু একটি চিত্রই অঙ্কিত নয়, সেই চিত্রের মধ্য দিয়া একটি উদাস সুরের লহরীকে অনুভব করা যায়। এখানেই গীতিকবিতার সার্থকতা

[ক] মৌখিক প্রশ্ন ঃ

(১) কবিতাটি কাহার রচনা ? কেন তাঁহার খ্যাতি ?
(২) কবির বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম কি ?
(৩) কবিতাটির যে কোনো ৮ লাইন মুখস্থ বল।

[খ] সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) কবিতাটিকে 'মধ্যাহ্ন সঙ্গীত' বলা হইয়াছে কেন ? এখানে কোন্ ঋতুর মধ্যাহ্ন বর্ণিত ?
(২) 'ঘু ঘু ঘু......করুণ করিয়া গায় ?'—কপোতী কেন ডাকিতেছে ? সে কাতর কেন ?

গ] রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) কবি-প্রদত্ত নিদাঘ মধ্যাহ্নের ছবিটি নিজের ভাষায় লেখ।
(২) 'তাপিত কায়' জুড়াইবার জন্য কবির প্রার্থনা কি—নিজের ভাষায় লেখ।

[ঘ] **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :**

(১) 'মহা-মহেশ্বর-করুণা-রূপিণী মোহিনী মায়ার প্রায়।'—**প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া** ব্যাখ্যা কর।

[ঙ] **ব্যাকরণগত প্রশ্ন :**

(১) শব্দার্থ বল ও বাক্য রচনা কর : পাদপ, সঞ্চরণ, **সরসী, মেদুর।**

(২) গদ্যরূপ দাও : মুরতি, স্তব্ধ, স্ফুরতি, মেদুর।

(৩) **ভুল থাকিলে সংশোধন কর :**

বয়ে এস সেই সমির মেদুড়।
ঝুরু-ঝুরু-ঝুরু অধির মধুর।
স্নেহ আলিঙ্গ জুরাব জীবন
জুরাব তাপীত কায় ?



জন্মভূমি

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা ;
তাহার মাঝে আছে দেশ এক,—সকল দেশের সেরা,
ও যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ;
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি !
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমন ধারা !
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ, এমন কালো মেঘে !
তারা পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠে, পাখীর ডাকে জেগে ;
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি !
এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড় !
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশতলে মিশে !
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি !
পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে,—
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি !

ভা'য়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলেপাবে কেহ !
ও—মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি—
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি !

অনুশীলনী

পাঠ-সংকেত : কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কখনো ডি. এল. রায় নামে পরিচিত। দেশাত্মবোধক সঙ্গীত এবং নাটক রচনায় তিনি সুবিখ্যাত। 'জন্মভূমি' তাঁহার একটি প্রসিদ্ধ, লোকপ্রিয় গান। গানটি তাঁহার 'সাজাহান' নাটকে আছে। এই গানের মধ্যে ভারতের একটি ঐশ্বর্যময় প্রকৃতি চিত্র যেমন আছে, তেমনি সেই চিত্রের মধ্য দিয়া স্বদেশকে ভালোবাসার যে একটা প্রবল আকুতি, তাহা প্রতি স্তবকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহার দুইটি প্রধান কথা : স্বপ্ন অর্থাৎ আদর্শ ও দেশপ্রেমের কথা এবং 'স্মৃতি' অর্থে পূর্বতন কত বংশধারার মধ্য দিয়া আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য বহিয়া আসিতেছে।

[ক] মৌখিক প্রশ্ন :

(১) কবিতাটির রচয়িতা কে ? কেন তাঁহার খ্যাতি ?

(২) কবিতাটির প্রথম ১০ লাইন মুখস্থ বল।

[খ] রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :

(১) 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি'—কবির এ গর্ব কেন ? কি গুণ ও বৈশিষ্ট্যে কবি ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, নিজের ভাষায় লেখ।

[গ] ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :

(১) প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া তাৎপর্য বুঝাইয়া ব্যাখ্যা কর :
'ও যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।'

[ঘ] ব্যাকরণগত প্রশ্ন :

(১) অর্থ লেখ : উজল, ধূম্র, হরিৎক্ষেত্র, কুঞ্জ, শাখী।

(২) গদ্যান্তর কর :

(i) চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমন ধারা !
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ, এমন কালো মেঘে !

(ii) পুষ্পে পুষ্পে ভরা······মধু খেয়ে।

(৩) ভুল সংশোধন কর :
চড়ায় ভরা নদী কাহার, কোথায় এমন রুক্ষ পাহাড় !
কোথায় এমন মড়কক্ষেত্র আকাশ তলে মিশে !



গার্হস্থ্যচিত্র

—গিরীন্দ্রমোহিনী দেবী

ফুটফুটে জোছনায়, ধব্‌ধবে আঙ্গিনায়
একখানি মাদুর পাতিয়ে,
ছেলেটি শুয়ায়ে কাছে জননী শুইয়া আছে
গৃহকাজে অবসর পেয়ে।
সাদা সাদা মুখ তুলি', জুঁই, শেফালিকাগুলি
উঠানের চৌদিকে ফুটিয়ে,
প্রাচীরেতে সুশোভিতা রাধিকা, ঝুমকালতা,
দুলিতেছে চন্দ্র-করে নেয়ে।
মৃদু ঝুরু ঝুরু বায় বসন কাঁপায়ে যায়,
ঝরে যায় কামিনীর ফুল ;
প্রশান্ত মুখের পরে কালো কেশ উড়ে পড়ে,
অলসেতে আঁখি ঢুলু ঢুলু !
মৃদু মৃদু ধীর হাতে, আঘাতি শিশুরমাথে,
গায় ঘুম-পাড়ানিয়া গান।
মোহিয়া সুস্বর ভাষে, আকুল কি ফুলবাসে,
পিঞ্জরে ধরেছে পাখী পিউ পিউ তান !
শিয়রেতে জেগে শশী, যেন সে সৌন্দর্যরাশি,
নেহারিছে মগ্ন হয়ে ভাবে।
ছেলে ডাকে 'আয় চাঁদ' ; মা বলিছে 'আয় চাঁদ,'
কি করিবে চাঁদ মনে ভাবে !

মা নাই ঘরেতে যার, ছেলে কোলে নাই যার
যত কিছু সব তার মিছে !
চাঁদে চাঁদে হাসা-হাসি, চাঁদে চাঁদে মেশামেশি,
স্বর্গে মর্ত্যে প্রভেদ কি আছে !

অনুশীলনী

পাঠ-সংকেত ঃ মহিলা কবিদের মধ্যে গিরীন্দ্রমোহিনী দেবী বিশেষ খ্যাতিমান। বর্তমান কবিতায় বাংলার পল্লী জীবনের প্রশান্ত একটি গৃহজীবন-চিত্র ও মধুর প্রকৃতি-চিত্র মা ও ছেলেকে কেন্দ্র করিয়া চিত্রিত হইয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, প্রকৃতি ও মানুষের একটি মধুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কল্পনা এ কবিতায় আছে। প্রকৃতি যতই সুন্দর হোক, যেখানে মা ও ছেলে নাই, সেখানে সবই ব্যর্থ হইয়া যায়।

[ক] মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। কবিতাটি কাহার রচনা ?

২। মা ও ছেলেকে আশ্রয় করিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সার্থকতা ও উহার অবর্তমানে তাহার ব্যর্থতা—এই ভাবটিকে কেন্দ্র করিয়া যে ৮ পংক্তি রচিত হইয়াছে, তাহা মুখস্থ বল।

[খ] সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। 'প্রশান্ত মুখের…ঢুলু ঢুলু !—কাহার আঁখি ঢুলু ঢুলু ? তাঁহাকে কোথায় দেখা যাইতেছে ? তাঁহার সঙ্গে আর কে আছে ? তিনি কি করিতেছেন ? তাঁহার চারিদিকের পরিবেশ কিরূপ ?

২। 'কি করিবে চাঁদ মনে ভাবে ! চাঁদের ভাবনা কেন ? কখন, কি অবস্থায় চাঁদকে দেখা যাইতেছে ?

[গ] রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। গার্হস্থ্য চিত্রটি নিজের ভাষায় লেখ।

২। নিসর্গ চিত্রের মাধুর্যটি বর্ণনা কর।

[ঘ] ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ

১। 'শিয়রেতে জেগে শশী…মগ্ন হয়ে ভাবে।' তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

২। 'চাঁদে চাঁদে…প্রভেদ কি আছে ?' প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

[ঙ] ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ

১। গদ্যরূপ দাও ঃ পাতিয়ে, ফুটিয়ে, আঘাতি, মোহিয়া, নেহারিছে।



সামান্য ক্ষতি

—— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বহে মাঘ মাসে শীতের বাতাস,
স্বচ্ছসলিলা বরুণা।
পুরী হ'তে দূরে গ্রামে নির্জনে
শিলাময় ঘাট চম্পকবনে,
স্নানে চলেছেন শত সখীসনে
কাশীর মহিষী করুণা।
স্নান সমাপন করিয়া যখন
কূলে উঠে নারী সকলে,
মহিষী কহিলা, 'উহু! শীতে মরি,
সকল শরীর উঠিছে শিহরি,
জেবলে দে আগুন ওলো সহচরী,
শীত নিবারিব অনলে।'
সখীগণ সবে কুড়াইতে কুটা
চলিল কুসুম কাননে।
কৌতুক রসে পাগল পরানী
শাখা ধরি সবে করে টানাটানি,
সহসা সবারে ডাক দিয়া রাণী
কহে সহাস্য আননে—
'ওলো তোরা আয় ওই দেখা যায়
কুটির কাহার অদূরে,

ওই ঘরে তোরা লাগাবি অনল,
তপ্ত করিব করপদতল,'
এত বলি রাণী রঙ্গে বিভল
হাসিয়া উঠিল মধুরে।

অতি দুর্দাম কৌতুকরত
যৌবন মদে নিষ্ঠুর যত
যুবতীরা মিলি পাগলের মত
আগুন লাগাল কুটিরে।

ঘনঘোর ধূমে ঘুরিয়া ঘুরিয়া
ফুলিয়া ফুলিয়া উড়িল।
দেখিতে দেখিতে হু হু হুংকারি
ঝলকে ঝলকে উল্কা উগারি
শত শত লোল জিহ্বা প্রসারি
বহ্নি আকাশ জুড়িল।

দলে দলে কাক করে কোলাহল,
উত্তর বায়ু হইল প্রবল
কুটির হইতে কুটিরে অনল
উড়িয়া উড়িয়া চলিল।

ছোট গ্রামখানি লেহিয়া লইল
প্রলয়লোলুপ রসনা।
জনহীন পথে মাঘের প্রভাতে
প্রমোদক্লান্ত শত সখী-সাথে
ফিরে গেল রাণী কুবলয় হাতে
দীপ্ত অরুণ-বসনা।

তখন সভায় বিচার-আসনে
বসিয়াছিলেন ভূপতি।

গৃহহীন প্রজা দলে দলে আসে,
দ্বিধাকম্পিত গদগদ ভাষে

নিবেদিল দুখ সংকোচ-ত্রাসে
চরণে করিয়া মিনতি।

সভাসন ছাড়ি উঠি গেল রাজা
রক্তিম মুখ শরমে।
অকালে পশিলা রাণীর আগার—
কহিলা, 'মহিষী, একি ব্যবহার।
গৃহ জ্বালাইলে অভাগা প্রজার
বলো কোন রাজ ধরমে!'

রুষিয়া কহিলা রাজার মহিষী,
'গৃহ কহ তারে কী বোধে!
গেছে গুটিকত জীর্ণ কুটির,
কতটুকু ক্ষতি হয়েছে প্রাণীর?
কত ধন যায় রাজমহিষীর
এক প্রহরের প্রমোদে।'

কহিলেন রাজা উদ্যতরোষ
রুধিয়া দীপ্ত হৃদয়ে—
'যতদিন তুমি আছ রাজরাণী
দীনের কুটিরে দীনের কি হানি
বুঝিতে নারিবে জানি তাহা জানি—
বুঝাব তোমারে নিদয়ে।'

পথে লয়ে তারে কহিলেন রাজা,
'মাগিবে দুয়ারে দুয়ারে—
এক প্রহরের লীলায় তোমার
যে-কটি কুটির হল ছার খার
যত দিনে পার সে-ক'টি আবার
গড়ি দিতে হবে তোমারে।

'বৎসরকাল দিলেম সময়,
তার পরে ফিরে আসিয়া
সভায় দাঁড়ায়ে করিয়া প্রণতি

সবার সম্মুখে জানাবে যুবতী
হয়েছে জগতে কতটুকু ক্ষতি
জীর্ণ কুটির নাশিয়া।'

অনুশীলনী

পাঠ-সংকেত ঃ রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত একটি আখ্যানমূলক কবিতা। কাশীরাজ-মহিষী করুণার কাছে যাহা সামান্য ক্ষতি, দুঃখী প্রজাদের কাছে তাহা জীবন মরণের প্রশ্ন। কাশীরাজের ন্যায়নিষ্ঠ রাজধর্ম রানীর এ নির্বোধ হঠকারিতাকে ক্ষমা করে নাই। তিনি কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। রাজধর্মের এই ন্যায়নিষ্ঠ বিচার এই কবিতার প্রতিপাদ্য।

[ক] **মৌখিক প্রশ্ন ঃ**

১। কবিতাটি কাহার রচনা? তাঁহার খ্যাতি কেন?
২। কবিতাটির মধ্যে, রাজার শাস্তিদান বিষয়ে রচিত ১২ লাইন মুখস্থ বল।
৩। 'সামান্য ক্ষতি' নামকরণ কি সঠিক হইয়াছে?

[খ] **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

১। 'স্নানে চলেছেন ... করুণা।' মহিষী কোথায় স্নানে চলিয়াছেন? সেখানকার পরিবেশটি কেমন? তখন কোন্ মাস?

২। 'এত বলি ··· উঠিল মধুরে।'—রানী কি বলিয়াছিলেন? 'রঙ্গে বিভল' কথার দ্বারা রানীর কোন্ চরিত্র প্রকাশ পাইয়াছে?

৩। 'ছোট গ্রামখানি···রসনা।'—গ্রামখানির কি অবস্থা হইল? প্রলয়লোলুপ রসনা কাহার? কেন এই কথা বলা হইল?

৪। 'সবার সম্মুখে ··· নাশিয়া।'—বক্তা কে? কাহাকে বলা হইয়াছে? ক্ষতিপূরণ কিভাবে করিতে বলা হইয়াছে?

[গ] **রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

১। স্নানের পর শীত নিবারণের জন্য রানী কি করিলেন, নিজের ভাষায় লেখ।

২। অগ্নিপ্রজ্জ্বলিত গ্রামের একটি চিত্র রচনা কর।

[ঘ] **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ**

১। প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা লেখ ঃ

(i) সভাসন ছাড়ি উঠে গেল রাজা
রক্তিম মুখ শরমে।

(ii) কতধন যায় রাজমহিষীর
এক প্রহরের প্রমোদে।

(iii) যতদিন তুমি আছ রাজরানী ··· বুঝাব তোমারে নিদয়ে।

[ঙ] **ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ**

১। গদ্যরূপ লেখ ঃ নিবারিব, পরানী, বিভল, উগারি, প্রসারি, নারিবে।
২। শব্দার্থ লেখ ঃ সমাপন, নিবারিত, রসনা, কুবলয়, দ্বিধাকম্পিত।
৩। গদ্যান্তর কর ঃ 'পথে লয়ে তারে ··· দিতে হবে তোমারে।'



ওরা কাজ করে

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাটির পৃথিবী-পানে আঁখি মেলি যবে
দেখি, সেথা কল কল রবে
বিপুল জনতা চলে
নানা পথে নানা দলে দলে
যুগযুগান্তর হতে মানুষের নিত্য-প্রয়োজনে
জীবনে মরণে।
ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল ;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।
রাজছত্র ভেঙে পড়ে ; রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে ;
জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে ;
রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত-আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।
ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে,

অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের সমুদ্র-নদীর ঘাটে ঘাটে,
পাঞ্জাবে বোম্বাই-গুজরাটে।
গুরু গুরু গর্জন, গুন্ গুন্ স্বর
দিন রাত্রে গাঁথা পড়ি' দিনযাত্রা করিছে মুখর।
দুঃখ সুখ দিবসরজনী
মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি।
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-'পরে
ওরা কাজ করে॥

অনুশীলনী

পাঠ-সংকেত : রবীন্দ্রনাথের এটি একটি বহুখ্যাত কবিতা, যেখানে কবির **অন্তর্ভেদী** দৃষ্টি আসিয়া পড়িয়াছে মানব সমাজের উপরে। এই সমাজের সভ্যতার যাত্রাপথে উপরতলার কত রাজা, কত দাম্ভিক দিগ্বিজয়ীর উদয়-বিলয় ঘটিয়াছে, তাহাদের ক্ষণকালীন প্রতাপ ও দম্ভের জয়স্তম্ভ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ধূলায় মিশাইয়া গিয়াছে। কিন্তু নীচের তলার মানুষ তাহাদের নিরবচ্ছিন্ন কর্মপ্রবাহ দ্বারা শুধু নিত্য-প্রয়োজন মিটানো নয়, সুদূর অতীত হইতে, কাল হইতে কালে মানব সমাজের জীবনপ্রবাহকে আজও অক্ষুণ্ন রাখিয়াছে। জীবনের সেই মহান্ মন্ত্রধ্বনি কবি শুনিতে পাইয়াছেন।

[ক] মৌখিক প্রশ্ন :

১। কবিতাটির প্রথম স্তবক মুখস্থ বল।
২। সম্পূর্ণ কবিতাটি আবৃত্তি কর।

[খ] সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। 'দেখি সেথা কল কল ··· জীবনে মরণে।'—কোথায় কবি এ দৃশ্য দেখিয়াছেন? 'নানা পথে' বলিতে কি বুঝাইতেছেন?—কবিতায় বিবৃত ওই সব পথের পরিচয় দাও।
২। 'ওরা কাজ করে······প্রান্তরে।'—ইহাদের পরিচয় কি? ইহারা কি কি কাজ করে? সে কাজ কতখানি প্রয়োজনীয়, বুঝাইয়া দাও।
৩। 'রক্তমাখা···মুখ ঢাকি।'—হাত তাহাদের রক্তমাখা কেন? ইহাদের পরিচয় কি? 'রক্ত আঁখির' তাৎপর্য কি? শিশুপাঠ্য কাহিনীতে মুখ ঢাকিয়া থাকার মানে কি?

৪। 'গুরু গুরু গর্জন…করিছে মুখর।'—কিসের গর্জন? কাহার স্বর? কিভাবে তাহা দিন রাতে গাঁথা হয়? কিভাবে দিনযাত্রা মুখর হয়?

[গ] **রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :**

১। 'ওরা কাজ করে…নগরে প্রান্তরে।' কবি-প্রদত্ত চিত্রটি নিজের ভাষায় লিখ।

২। তথাকথিত রাজমহিমার ব্যর্থতার চিত্রটি বুঝাইয়া লেখ।

[ঘ] **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :**

১। প্রসঙ্গ উল্লেখ পূর্বক ব্যাখ্যা লেখ :

—'জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে।

—'মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্র ধ্বনি।'

—'শত শত…কাজ করে॥'

[ঙ] **ব্যাকরণগত প্রশ্ন :**

১। শব্দার্থ : জয়স্তম্ভ, দিনযাত্রা, মুখর, মন্দ্রিত, ভগ্নশেষ।

২। গদ্যান্তর কর। 'গুরু গুরু গর্জন…মহামন্ত্র ধ্বনি।'



মা

—— রজনীকান্ত সেন

স্নেহ-বিহ্বল, করুণা-ছলছল,
শিয়রে জাগে কার আঁখিরে !
মিটিল সব ক্ষুধা, সঞ্জীবনী সুধা
এনেছে, অশরণ লাগিরে।
শ্রান্ত অবিরত যামিনী-জাগরণে,
অবশ কৃশ তনু মলিন অনশনে ;
আত্মহারা, সদা বিমুখ নিজ সুখে
তপ্ত তনু মম, করুণা ভরা বুকে
টানিয়া লয় তুলি', যাতনা তাপ ভুলি,
বদন-পানে চেয়ে থাকিরে !

করুণে বরষিছে, মধুর সান্ত্বনা
শান্ত করি' মম গভীর যন্ত্রণা ;
স্নেহ-অঞ্চলে মুছায়ে আঁখিজল,
ব্যথিত মস্তক চুম্বে অবিরল,
চরণ-ধূলি সাথে, আশীষ রাখে মাথে,
সুপ্ত হৃদি উঠে জাগিরে।
আপনি মঙ্গলা, মাতৃরূপে আসি',

শিয়রে দিল দেখা পুণ্য-স্নেহরাশি
বক্ষে ধরি' চির-পীযূষ-নির্ঝর,
নিরাশ্রয়-শিশু-অসীম-নির্ভর ;
নমো নমো নমঃ, জননী দেবী মম !
অচলা মতি পদে মাগিরে !

অনুশীলনী

পাঠ-সংকেত ঃ জীবনের নানা পর্যায়ে শৈশবের অসহায়তায়, রোগে-শোকে, বিপদে-দুঃখে জননীর জ্যোতির্ময়ী অবস্থানটি কবি তাঁহার সুবিখ্যাত এই সঙ্গীতে চিত্রিত করিয়াছেন।

[ক] **মৌখিক প্রশ্ন ঃ**

১। কবিতার রচয়িতা কে ? কেন তাঁহার খ্যাতি ?

২। কবিতাটির ১ম স্তবক মুখস্থ বল।

[খ] **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

১। 'স্নেহ বিহ্বল···কার আঁখিরে ?—কবি কাহার আঁখির কথা বলিতেছেন ? কি ভাবে তিনি জাগিয়া থাকেন ? কোথায় জাগিয়া থাকেন ?

২। 'আপনি মঙ্গলা···পুণ্য স্নেহরাশি।' মঙ্গলা কে ? কেন মঙ্গলা বলা হইয়াছে ? মাতৃরূপে তিনি কি ভাবে আসেন ?

[গ] **রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

১। নিরুপায় শৈশবে, মায়ের সদা-জাগ্রত চিত্রটি বিবৃত কর।

২। সন্তানের দুঃখ শোকে মায়ের সমব্যথী চিত্রটি নিজের ভাষায় লেখ।

[ঘ] **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ**

১। প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর ঃ

—'নিরাশ্রয়-শিশু-অসীম-নির্ভর।'

—'শান্ত করি মম গভীর যন্ত্রণা।'

[ঙ] **ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ**

১। শব্দার্থ লেখ ঃ সঞ্জীবনী, পীযূষ, নির্ঝর, অশরণ।

২। গদ্যরূপ লেখ ঃ বরষিছে, চুম্বে, হৃদি।

৩। গদ্যান্তর কর ঃ

'শ্রান্ত অবিরত···চেয়ে থাকিরে।'



রাজা কারিগর

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

রাজা-কারিগর বিশ্বকর্মা ! দুনিয়ার আদি মিস্তিরী !
তোমার হুকুমে হাতুড়ি হাঁকাই, করাতের দাঁতে শাল চিরি !
ঘাঁটা-পড়া কড়া লাখো হাতে তুমি গড়িছ কত কি কৌশলে !
কামার-শালের গন্‌গনে রাঙা আগুনে তোমার চোখ জ্বলে !
হাপরে তোমার নিঃশাস পড়ে খুব জানি মোরা খুব চিনি,
মাকু-ইঁদুরের গণেশ তুমি হে ছুটোছুটি চৌপর দিনই !
সিদ্ধি তোমার হাতে-হাতিয়ারে, সোনা কর তুমি খাক্‌ নিয়ে,
দুনিয়ার সমৃদ্ধি, তোমার গলে আঙুলের ফাঁক দিয়ে।

● ● ●

রাজা-কারিগর বিশ্বকর্মা ! স্বর্গে মর্ত্যে মিস্তিরী।
তোমার প্রসাদে শ্রমেও আমোদ, ধমনীতে ছোটে পিচকিরি।
তোমার হুকুমে হাতিয়ার ধরি আমরা বিশ্ব-বাংলাতে ;
থল্‌থলে মাটি, ঠন্‌ঠনে লোহা অনায়াসে পারি সাম্‌লাতে।
মণি-কাঞ্চনে আমরা মিলাই, মণি-মালঞ্চে হার গাঁথি,
বন-কাপাসীর হাসি কুড়াইয়া টানা দিই তাঁতে দিন রাতি।
রুখো শুখো কাঠে ফুল যে ফোটাই বাটালির ঘায়ে বশ করি,
কর্নিক, ছেনী, হাতুড়ি চালাই, তুর্‌পুন্‌ মাকু বাঁশ ধরি।

তোমার প্রসাদে শ্রমে অকাতর মোরা দড় বিশ কর্মেতে,
দীক্ষা নিয়েছি তোমারি হুকুমে পরিশ্রমের ধর্মেতে।
রাজা-কারিগর বিশ্বকর্মা ! বুনিয়াদি আদি-মিস্তিরী !
তোমার আশিসে হাতিয়ার হাতে হাসি-মুখে ত্রিভুবন ফিরি !

অনুশীলনী

পাঠ-সংকেত ঃ পৌরাণিক কল্পনা মতে, সমস্ত শিল্পকর্মের অধিদেবতা বিশ্বকর্মার বন্দনা রচনার মধ্য দিয়া কবি এখানে বিশ্বের যন্ত্রশিল্পী ও কর্মীদেরই প্রশস্তি গান করিয়াছেন। প্রাচীন এবং আধুনিক জগতের সমস্ত সম্পদ তাহারাই সৃষ্টি করিতেছে। সে সম্পদ শুধু ধনসংগ্রহে নয়, সুকুমার শিল্পসৃষ্টিতেও। তাঁহাদের শ্রমেই সারা বিশ্ব ঐশ্বর্যে ভরিয়া উঠিয়াছে।

[ক] মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। কবিতাটির রচয়িতা কে ? কেন তাঁহার খ্যাতি ?
২। 'রাজা কারিগর' কাহাকে বলা হইয়াছে ? রাজা আবার কারিগর কেন ?
৩। বিশ্বকর্মা কে ?

[খ] সংক্ষিপ্ত উত্তরাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। 'ঘাঁটাপড়া···কি কৌশলে !'—লাখো হাত কাহাদের ? কেন তাহাদের হাত ঘাঁটা-পড়া ? তাহারা কি গঠন করে ?
২। 'মাকু-ইঁদুরের···চৌপ'র দিনই।'—'মাকু-ইঁদুর' মানে কি ? 'গণেশ' কাহাকে বলা হইয়াছে ? চৌপর দিন ছুটোছুটির কারণ কি ? তাহার ফল কি হয় ?
৩। 'দুনিয়ার সমৃদ্ধি···ফাঁক দিয়ে।'—এখানে কাহার কথা বলা হইয়াছে ? দুনিয়ার সমৃদ্ধির সঙ্গে তাহার সম্পর্ক কি ?

[গ] রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। কারুশিল্প বা সুকুমার শিল্প সৃষ্টির যে কথা কবি বিবৃত করিয়াছেন, নিজের ভাষায় তাহা বুঝাইয়া দাও।

[ঘ] **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ**

১। প্রসঙ্গ উল্লেখ সহ তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও ঃ
—'কামারশালের…চোখ জ্বলে।'
—'দুনিয়ার সমৃদ্ধি…ফাঁক দিয়ে।'
—'বনকাপাসীর · দিন রাতি।'
—'দীক্ষা নিয়েছি তোমারি … ধর্মেতে।'

[ঙ] **ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ**

১। শব্দার্থ লেখ ঃ সিদ্ধি, দড়, বুনিয়াদি, বা'শ।
২। গদ্যরূপ লিখ ঃ মিস্তিরী, চৌপর, আশিসে।
৩। গদ্যান্তর কর ঃ
তোমার প্রসাদে … ত্রিভুবন ফিরি।
৪। ভুল সংশোধন কর ঃ
মণি-কাঞ্চনে আমরা খোদাই, মণি-মালঞে হার গড়ি,
বন-তুলসীর হাসি উপাড়িয়া টানা দিই তাঁতে চার ঘড়ি।
রুখো শুখো মাঠে ফুল যে ফোটাই, কাস্তের ঘায়ে বশ করি।
কর্ণিক, ছেনী, কোদাল চালাই, তুরপুন্ মাকু ফস করি।



চল্ চল্ চল্

—— কাজী নজরুল ইসলাম

চল্ চল্ চল্
ঊর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী-তল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্‌রে চল্‌রে চল্
চল্ চল্ চল্ ॥
ঊষার দুয়ারে হানি' আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত;
আমরা টুটাব তিমির রাত,
বাধার বিন্ধ্যাচল।
নবনবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহা শ্মশান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল।
চল্ রে নও-জোয়ান,
শোন্ রে পাতিয়া কান—
মৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে-দুয়ারে
জীবনের আহ্বান।
ভাঙ্‌রে ভাঙ্ আগল,
চল্‌রে চল্‌রে চল্।
চল্ চল্ চল্ ॥

অনুশীলনী

পাঠ-সংকেত ঃ কাজী নজরুল ইসলামের এ কবিতা জাতীয় আন্দোলনের যুগে ছিল দেশাত্মবোধে জাগ্রত ছাত্র সমাজের অত্যন্ত জনপ্রিয় সঙ্গীত—তাহাদের কুচকাওয়াজের গান। ইংরেজ তখন দেশের শাসক। তাহারাও হাজার হাজর ছাত্রকে জেলে পাঠাইয়াছে, কাহাকেও বা ফাঁসী দিয়াছে, গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এ সঙ্গীতের জন্ম। কবি এখানে ডাক দিয়াছেন দেশের সেই তরুণ শক্তিকে, যাহারা দুর্যোগের সব বাধাবিঘ্ন চুরমার করিয়া, মরা দেশে প্রাণের বন্যা বহাইয়া দিবে, দেশের মুক্তি-স্বপ্নকে সার্থক করিবে।

[ক] মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। এই কবিতার রচয়িতা কে? তাঁহার সম্বন্ধে কি জান?
২। কবিতার শিরোনামের অর্থব্যঞ্জনা কি, বল।
৩। কবিতাটি আবৃত্তি কর।

[খ] সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

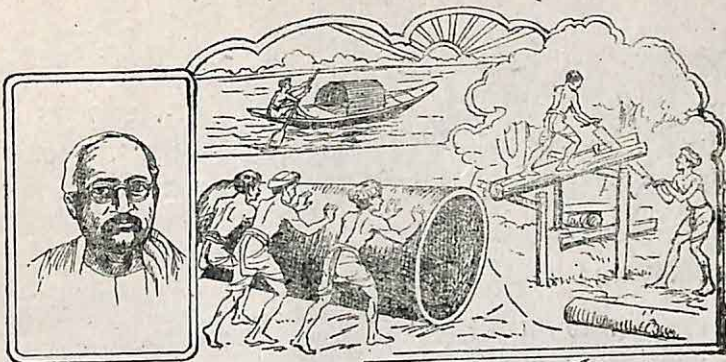
১। 'চল্ চল্ চল্, ... ধরণীতল।'—এই বলিয়া কবি কাহাদের ডাক দিয়াছেন? কোন্ অবস্থার মধ্য দিয়া তাহাদের অগ্রসর হইতে বলিতেছেন? ধরণীতল উতলা কেন?
২। 'আমরা টুটাব ... বাধার বিন্ধ্যাচল।'—কোন্ 'রাঙা প্রভাত' কবি আনিবার কথা বলিতেছেন? 'তিমির রাত্রি' কিসের? এই 'বাধার বিন্ধ্যাচল'—কিরূপ?

[গ] রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। দেশের নবীন শক্তিকে আহবান করিরা কবি যে কর্তব্য সাধনে উদ্যত, তাহা নিজের ভাষায় লেখ।

[ঘ] ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ

১। তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও ঃ
(i) —'ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণীতল।'
(ii) 'নবনবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান।'
(iii) 'মৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে দুয়ারে
জীবনের আহবান।'
২। টীকা লেখ ঃ বাধার বিন্ধ্যাচল, মহাশ্মশান।
৩। শব্দার্থ লেখ ঃ নও-জোয়ান।



কর্ম শুধু ঘর্ম নহে

—— কালিদাস রায়

কোনো কাজে মন লাগে না, জ্বর আসে আজ কাজের নামে,
নগর ছেড়ে গেলাম আজি বেড়াতে তাই একটি গ্রামে !
পথে যেতে শুনতে পেলাম ছাত পিটানোর ধ্বনির সাথে
তালে তালে গান গেয়ে সব রাজরেজারা হর্ষে মাতে !
এগিয়ে যেতে ডাইনে দেখি ধূলোমাখা ক'জন কুলী,
'হেঁইয়ো জোয়ান' গান ধরে কি ভারী জিনিস ঠেলছে তুলি' !
বাঁয়ে দেখি ঘাঘরা পরা মেয়েগুলো ঘুরায় জাঁতা,
গান ধরেছে সমস্বরে তালে তালে দুলিয়ে মাথা।
নদীর ধারে এলাম ক্রমে দেখতে দেখতে কাণ্ড হেন,
ঠাণ্ডা হাওয়া লাগল গায়ে মনটা হলো হালকা যেন।...
চলছে তরী স্রোতের বুকে নেচে নেচে হেলে দুলে,
দাঁড়ী মাঝি সমস্বরে গান ধরেছে পরাণ খুলে।
করাতীরা কাঠ চিরিছে নদীর ধারে গাছের তলে,
মনে হলো নাচ্ছে তারা উল্লাসে কাঠ চেরার ছলে।...
গাঁয়ে ঢুকে ডাইনে দেখি কামারশালে বাপ-বেটাতে
লোহা পেটায়, পেটাক তারা, নাচছে কেন হাতুড়ি হাতে ?

এসব দেখে মনে হ'ল, কর্ম শুধু ঘর্ম নহে,
বিশ্বকর্মা বেজায় রসিক, তাঁয় বেরসিক মূর্খে কহে।
শ্রমের বুকে প্রেম নাচে গায়, কর্মেরো প্রাণ মর্ম আছে,
শুধুই সে তো ঘামায় নাক, গাওয়ায় গাহে, নাচায় নাচে।

অনুশীলনী

পাঠ-সংকেত ঃ কবিশেখর কালিদাস রায় তাঁহার এই কবিতায় ঘর্মসিক্ত কর্ম বা শ্রমের মধ্যে একটি ছন্দের, সঙ্গীতের আবিষ্কার করিয়াছেন। নিরস শ্রমের মধ্যে কর্মী বা শ্রমিক একটা সঙ্গীতের সুর লাগাইয়া তাহাকে নিরসতার সীমা পার করিয়া দেয়। ইহাকেই কবি বলিয়াছেন—শুধুই সে তো ঘামায় না, গাওয়ায় গাহে, নাচায় নাচে।

[ক] মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। কবিতার রচয়িতা কে?
২। কবিতার শিরোনাম কি সঠিক বলিয়া মনে কর, কারণ দেখাও।

[খ] সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। 'কোন কাজে ··· কাজের নাম।' কর্মভীরু কবির এই ধারণা কি ভাবে ভাঙিল? তিনি কোথায় কি দৃশ্য দেখিলেন?
২। 'এসব দেখে ··· মূর্খে কহে।' কিসব দেখিয়া কবির ভুল ভাঙ্গিল? 'বিশ্বকর্মা' কাহাকে বলা হইয়াছে? কি হিসাবে তিনি রসিক? মূর্খ কাহাদের বলা হইয়াছে?

[গ] রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। শ্রমের মধ্যে কবি যে সঙ্গীতের সংযোগ দেখিয়াছেন তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

[ঘ] ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ

১। শ্রমের বুকে ··· নাচায় নাচে।' প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর।
—'কর্মের প্রাণ মর্ম।' কথাটির তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও।



সাধারণ

—কুমুদরঞ্জন মল্লিক

ক্ষুদ্র মোরা, তুচ্ছ মোরা, আমরা সাধারণ
দুঃখ এবং দৈন্য সাথে নিত্য করি রণ।
আমরা তৃণ রৌদ্রে পুড়ি   শুষ্ক পাতা শূন্যে উড়ি
চির দিবস অগণ্য রই আমরা অগণন।
তারার কণা আমরা গড়ি, বিশাল ছায়াপথ,
পুরীর রেণু-বুক দিয়ে যায় জগন্নাথের রথ।
মোদের জীবন, মোদের চিতা   রাত্রি করে দীপান্বিতা,
দধীচির সব অস্থি করি দম্ভোলি সৃজন।
দুর্ভিক্ষেতে শুকায় মোদের শুষ্ক দেহখান,
মড়ক মুখে লাখে লাখে দক্ষিণা দিই প্রাণ।
পিষে মরি খনির তলে   ডুবে মরি লবণ জলে,
মোদের পরাণ মহাকালের নিত্য প্রয়োজন।
প্রলয় মুখে আমরা ভাসি পিপীলিকার প্রায়,
ধরার ধূলি আমরা ছুটি ঝড়ের ইসারায়।
আমরা পলি, আমরা বালি   পথেই পাতাই গৃহস্থালী,
বিন্দু সলিল আমরা করি নদের আয়োজন।

অনুশীলনী

পাঠ-সংকেত : কবির বক্তব্য—সাধারণত দরিদ্র জনসাধারণের অংশকে তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র করিয়া দেখা হয়। কিন্তু উহা ঠিক নয়। মড়কে দুর্ভিক্ষে তাহারা লক্ষে লক্ষে

প্রাণ হারায়। প্রবল বন্যায় তাহারা পিপীলিকার মত ভাসিয়া যায়। প্রতি দিনের জীবনযুদ্ধে তাহারা ক্ষতবিক্ষত। দরিদ্র শ্রমিক রূপে কখনো খনির তলায়, কখনো সমুদ্র বক্ষে অপঘাতে তাহাদের মৃত্যু ঘটে। তাহাদের কথা বড় করিয়া কখনো ভাবা হয় না। এই ক্ষুদ্র ও নগণ্য তুচ্ছের মধ্যে কবি কিন্তু মহৎ ও বৃহতের সন্ধান পাইয়াছেন। একত্রে দেখিলে ইহারা বিশাল। অসংখ্য ক্ষুদ্র জলকণা এক যোগে যেমন মহানদের সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীকে ঐশ্বর্যময় করে তেমনি ইহারাও অলক্ষ্যে আমাদের সব সম্পদ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। একযোগে তাহারা মহাশক্তির আধার।

[ক] **মৌখিক প্রশ্ন :**

১। কবিতাটির রচয়িতার নাম কি ?
২। কবিতার শিরোনাম 'সাধারণ' বলিতে কি বুঝ।
৩। দধীচি কে ?

[খ] **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :**

১। 'মোদের পুরাণ মহাকালের নিত্যপ্রয়োজন।'—কাহাদের প্রাণের কথা বলা হইতেছে ? মহাকালের নিত্যপ্রয়োজন'—এ কথার অর্থ কি ? কি ভাবে এই নিত্যপ্রয়োজন সাধিত হইতেছে ?

[গ] **রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :**

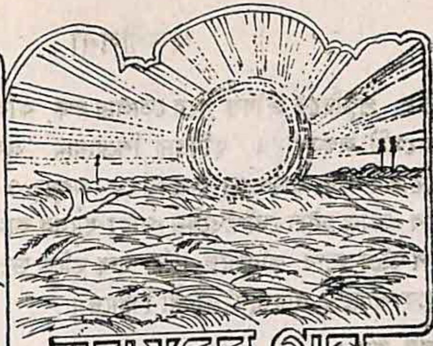
১। সাধারণ বলিতে কবি কাহাদের বুঝাইয়াছেন, তাহাদের অবস্থার কেমন পরিচয় তিনি এ কবিতায় দিয়াছেন, সংক্ষেপে তা লেখ।

[ঘ] **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :**

১। প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর :
—'তারার কণা আমরা গড়ি, বিশাল ছায়া পথ।'
—'পুরীর রেণু-বুক দিয়ে যায় জগন্নাথের রথ।'
—'দধীচির সব অস্থি করি দম্ভোলি সৃজন।'
—'বিন্দু সলিল আমরা করি নদের আয়োজন।'
—'ধরার ধূলি···ঝড়ের ইসারায়।'

[ঙ] **ব্যাকরণগত প্রশ্ন :**

১। শব্দার্থ লেখ : দীপান্বিতা, দম্ভোলি, সৃজন।
২। টীকা লেখ : দধীচি।

অবসরের গান

— *জীবনানন্দ দাশ*

শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে
অলস গেঁয়োর মতো এইখানে কার্তিকের খেতে ;
মাঠের ঘাসের গন্ধ বুকে তার—চোখে তার শিশিরের ঘ্রাণ,
তাহার আস্বাদ পেয়ে অবসাদে পেকে ওঠে ধান,
দেহের স্বাদের কথা কয় ;
বিকালের আলো এসে (হয়তো বা) নষ্ট করে দেবে তার সাধের সময় ।

চারিদিকে এখন সকাল—
রোদের নরম রং শিশুর গালের মতো লাল ;
মাঠের ঘাসের পরে শৈশবের ঘ্রাণ—
পাড়াগাঁর পথে ক্ষান্ত উৎসবের এসেছে আহ্বান ।

চারিদিকে নুয়ে পড়ে ফলেছে ফসল,
তাদের বোঁটার থেকে ফোঁটা ফোঁটা পড়িতেছে শিশিরের জল ;
প্রচুর শস্যের গন্ধ থেকে থেকে আসিতেছে ভেসে
পেঁচা আর ইঁদুরের ঘ্রাণে ভরা আমাদের ভাঁড়ারের দেশে !
শরীর এলায়ে আসে এইখানে ফলন্ত ধানের মতো ক'রে,
যেই রোদ একবার এসে শুধু চলে যায় তাহার ঠোঁটের চুমো ধ'রে
আহ্লাদের অবসাদে ভরে আসে আমার শরীর,
চারিদিকে ছায়া-রোদ-খুদ-কুঁড়ো-কার্তিকের ভিড় ;
চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে, এখানে হতেছে স্নিগ্ধ কান,
পাড়াগাঁর গায়ে আজ লেগে আছে রূপশালি ধান-ভানা ঘ্রাণ ।

অনুশীলনী

পাঠ-সংকেত ঃ প্রকৃতিকে জীবন্ত করে তোলায় দক্ষ কবি জীবনানন্দ দাশ। বর্তমান কবিতায় সেটি লক্ষ্যণীয়। কবিতার শিরোনাম 'অবসরের গান।' ধান রোপণ এবং উত্তোলন—এর মাঝখানে কৃষকের যে অবসর ও ভবিষ্যত্রে সুখস্বপ্ন, তার সঙ্গে কবি একান্ত হইয়া দেখিতেছেন পাকা-ধানের কাল কার্তিকের গ্রাম-বাংলাকে। তার রূপ তাঁকে মুগ্ধ করিয়াছে, তার গন্ধ তাঁকে উতলা করিয়া দিয়াছে, তার রস তাঁর মনকে আনন্দে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছে।

[ক] মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। এই কবিতার রচয়িতা কে ?

২। 'অবসরের গান', এই শিরোনাম কি সঠিক হইয়াছে মনে কর ? —কেন ? কারণ বল।

[খ] সংক্ষিপ্ত-উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। 'অলস গেঁয়োর মতো এইখানে কার্তিকের খেতে।' অলস গেঁয়ো কাহাকে বলা হইয়াছে ? কে কি করিতেছে ? সময়টা কোন ঋতু ?

২। 'পাড়াগাঁর পথে ক্ষান্ত উৎসবের এসেছে আহ্বান।'—ক্ষান্ত উৎসবের অর্থ কি ? আহ্বান কিসের ? কোন্ উৎসব ?

৩। 'চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে।' কাহার ক্ষুধা মিটিয়া যায় ? চোখের ক্ষুধার স্বরূপ বুঝাইয়া বল। ক্ষুধা মিটিতেছে কি ভাবে ? কোথায় এই ক্ষুধা মিটে ?

[গ] রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। কার্তিকের ভোরের রোদের চিত্রটি নিজের ভাষায় বিবৃত কর।

২। গ্রাম বাংলার কার্তিকের চিত্ররূপ কবির অনুসরণে রচনা কর।

[ঘ] ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ

১। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর ঃ

—'তাহার আস্বাদ পেয়ে অবসাদে পেকে ওঠে ধান।'

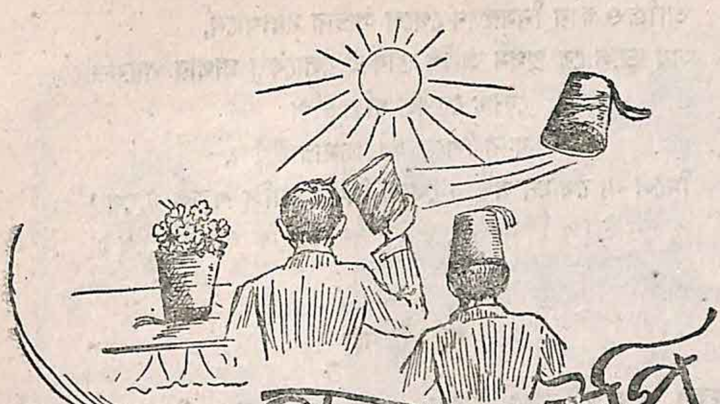
—'চারিদিকে ছায়া-রোদ-খুদ-কুঁড়ো-কার্তিকের ভিড়।'

—'পাড়াগাঁর গায়ে আজ লেগে আছে ··· ভানা ঘ্রাণ।'

[ঙ] ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ

১। গদ্যান্তর কর ঃ

'শুয়েছে ভোরের রোদ ··· পেকে ওঠে ধান।'



হারানো টুপি

— কাজী কাদের নওয়াজ

টুপি আমার হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে ভাইরে,
বিহনে তার এই জীবনে কতই ব্যথা পাইরে !
হাসবে লোকে শুনলে পরে
হারাল সে কেমন ক'রে,
কেমন ক'রে বৈশাখী ঝড় উড়িয়ে দিল মোর সে টুপি,
বুঝেছি হায় টুপির লোভে দেবতাদেরই এ কারচুপি ।

থাকত টুপি দুপুররোদে ছায়ার মতোই মাথায় মম,
কখনো বা বাতাস পেতাম ঘুরিয়ে তারে পাখার সম !
বক্ষে তাহার নিতুই প্রাতে
ফুল রেখেছি আপন হাতে,
সে ছিল মোর ফুলদানি আর ফুলের সাজি একসাথে হায়,
জানিনে আজ কোথায় গেছে কোন দেশে সে কোন্ অলকায় !

হয়তো এখন পবনদেবের মাথায় আছে সেই টুপি মোর,
এদিকে তার বিচ্ছেদে হায় আমার চোখে ঝরতেছে লোর !
ভুলতে নারি টুপির প্রীতি,
জাগছে হৃদে শুধুই স্মৃতি,—
বিদেশ গেলে বালিশ হত হায় সে টুপি মোর শিয়রে,
চলতে পথে সেলাম পেতাম থাকলে টুপি মাথার পরে ।...

আজিও হায় নিমন্ত্রণে গেলে সভার মধ্যখানে,
সব ভুলে যে প্রথম আমি তাকাই লোকের মাথার পানে ॥
দেখি কেবল চুপি চুপি
কার শিরে রয় আমার টুপি,—
মিলে না খোঁজ, সভার থেকে ফিরে আসি শুষ্ক মুখে ;
নূতন টুপি কিনব না, ভাই, পণ করেছি মনের দুখে ॥

অনুশীলনী

পাঠ-সংকেত ঃ হাল্‌কা রসের কবিতা। যে টুপি ছিল কবির ছাতা, বালিশ, ফুলদানি, যে টুপি মাথায় থাকিলে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত—সেই টুপি বৈশাখী ঝড়ে কবির মাথা হইতে একদিন কোথায় উড়িয়া গেল! কবির এই বেদনা ব্যাখ্যানের মধ্য দিয়া একটা কৌতুক রস উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

[ক] **মৌখিক প্রশ্ন ঃ**

১। এই কবিতার রচয়িতা কে ?

২। কবিতার নামকরণ কি সঠিক হইয়াছে ?

[খ] **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

১। 'জানিনে আজ … কোন অলকায়।'—কবি কাহার কথা বলিতেছেন ? অলকাপুরী কোথায় ? কি ভাবে সে গেল ? কবির সহিত তাহার সম্পর্ক কিরূপ ছিল ?

২। 'মিলে না খোঁজ…শুষ্ক মুখে।' —কাহার খোঁজ মেলেনা ? কবি কোথায় খোঁজ করেন ? কেন তিনি শুষ্ক মুখে ফিরিয়া আসেন ?

[গ] **রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

১। টুপিটির সহিত কবির কত রকমে সম্পর্ক ছিল, নিজের ভাষায় লেখ।

[ঘ] **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ**

১। 'চলতে পথে সেলাম পেতাম থাকলে টুপি মাথার 'পরে'—সেলাম পাইতেন কবি কেন, প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া কথাটির তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও।

[ঙ] **ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ**

১। শব্দার্থ লেখ ঃ বিহনে, অলকা, লোর, কারচুপি।

২। সাধু গদ্যে লেখ ঃ নিতুই, ঝরতেছে, নারি।

৩। গদ্যরূপ কর ঃ আজিও হায় নিমন্ত্রণে…পণ করেছি মনের দুখে।

———



হঠাৎ যদি

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

আমাঁয় যদি হঠাৎ কোনো ছলে
কেউ করে দেয় আজকে রাতের রাজা,
গোটাকয়েক করি আইন জারি
দু-এক জনায় খুব কষে দিই সাজা।

মেঘগুলোকে করি হুকুম—সব
ছুটি তোদের, আজকে মহোৎসব,
বৃষ্টি ফোঁটার ফেলি চিকন চিক্,
ঝুলিয়ে ঝালর ঢাকি চতুর্দিক,
দিলদরিয়া মেজাজ করে কই,
বাজগুলো সব স্ফূর্তি করে বাজা!
আমায় যদি হঠাৎ কোনো ছলে
কেউ করে দেয় আজকে রাতের রাজা।

হাওয়ায় বলি, হল্লা করে চল্
তারার বাতি নিভিয়ে দলে দল,
অন্ধকারে সত্যি কথার শেষে
রাজকন্যা পদ্মাবতীর দেশে
ঘুমের পুরীর সেপাইগুলো ঢোলে,
তাদের ধরে খুব কষে দিই সাজা।

আমায় যদি হঠাৎ কোনো ছলে
কেউ করে দেয় আজকে রাতের রাজা।
ওলট পালট করি বিশ্বখানা
ভাঙি যেথায় যত নিষেধ মানা ;
মনের মত কানুন করি ক'টা
রাজা হওয়ার খুব করে নিই ঘটা।
সত্য তা সে যতই বড় হোক—
কঠোর হলে, দিই তাহারে সাজা।
আমায় যদি হঠাৎ কোনো ছলে
কেউ করে দেয় আজকে রাতের রাজা।

অনুশীলনী

পাঠ-সংকেত ঃ এ কবিতায় কবির বয়ানে, একটি বালকের খেয়ালখুশি ও চিন্তা ধরা পড়িয়াছে। কবিতাটি লঘু চালে বালকের বর্ষারাতের আনন্দ লইয়া সুরু, শেষের দিকে অতি সহজ কথায় তাহার অনভিজ্ঞ কিন্তু নিষ্পাপ মনে একটি মস্ত কামনা প্রকাশ পাইয়াছে—সত্য 'কঠোর হলে দিই তাহারে সাজা' এবং নিষেধের বেড়াজালে জীবন যেন সংকীর্ণ না হইয়া যায়।

[ক] মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। কবিতাটির রচয়িতা কে ?
২। এই কবিতায় ইচ্ছাপূরণের যে সাধ, তাহা কবির, না কোনও বালকের ?

[খ] সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। 'দু-এক জনায় খুব কষে দিই সাজা।' —কোন্ অধিকারে বক্তা সাজা দিবে ? এই কবিতায় কাহাকে কাহাকে সাজা দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ পাইয়াছে ?
২। ছুটি তোদের আজকে মহোৎসব।'—কাহাকে একথা বলা হইয়াছে ? মহোৎসবটা কিরূপ, নিজের ভাষায় বিবৃত কর। এই মহোৎসবের সময়টা কখন ?
৩। 'ঘুমের পুরীর···দিই সাজা।' এই ঘুমের পুরী কোথায় ? সেপাইদের কেন সাজা দিবার ইচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছে ? ঘুমের পুরীতে কবি কাহাকে কি ভাবে যাইতে বলিতেছেন ?

[গ] রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :

১। বর্ষা মহোৎসবের যে চিত্রটি কবি আঁকিয়াছেন, তাহার বর্ণনার মাধুর্য নিজের ভাষায় প্রকাশ কর।

২। 'মনের মত···নিই ঘটা।' কানুনগুলি কি, সংক্ষেপে বল।

[ঘ] ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :

১। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর :

(i) 'ওলট পালট করি বিশ্বখানা
ভাঙি যেথায় হত নিষেধ মানা।'

(ii) 'সত্য তা সে যতই বড় হোক—
কঠোর হলে দিই তাহারে সাজা।'

[ঙ] ব্যাকরণগত প্রশ্ন :

১। গদ্যান্তর কর :
'মেঘগুলোকে করি···আজকে রাতের রাজা।'

২। ভুল থাকিলে সংশোধন কর :
হাওয়ায় বলি, ধাক্কা মেরে চল্
রাতের তারা নিভিয়ে দলে দল,
অন্ধকারে মিথ্যে কথার শেষে
রাজকন্যা কংকাবতীর দেশে
ঘুমের পরীর চোখগুলো সব চুলে,
তাদের ধরে খুব চটে দিই সাজা।



আমার দেশ

—সুকান্ত ভট্টাচার্য

এ আকাশ, এ দিগন্ত, এই মাঠ, স্বপ্নের সবুজ ছোঁয়া মাটি,
সহস্র বছর ধ'রে একে আমি জানি পরিপাটি,
জানি এ আমার দেশ অজস্র ঐতিহ্য দিয়ে ঘেরা,
এখানে আমার রক্তে বেঁচে আছে পূর্বপুরুষেরা ।....
আমার সম্মুখে খেত, এ প্রান্তরে উদয়াস্ত খাটি,
ভালবাসি এ দিগন্ত, স্বপ্নের সবুজ ছোঁয়া মাটি ;
এখানে রক্তের দাগ রেখে গেছে চেঙ্গিস্, তৈমুর,
সে চিহ্নও মুছে দিল কত উচ্চৈঃশ্রবাদের খুর ।
কত যুদ্ধ হয়ে গেছে, কত রাজ্য হয়েছে উজাড়,
উর্বর করেছে মাটি কত দিগ্বিজয়ীর হাড় ।
তবুও অজেয় এই শতাব্দী-গ্রথিত হিন্দুস্থান,
এরই মধ্যে আমাদের বিকশিত স্বপ্নের সন্ধান ।
আজন্ম দেখেছি আমি অদ্ভুত নতুন এক চোখে,
আমার বিশাল দেশ আসমুদ্র ভারতবর্ষকে ।

অনুশীলনী

পাঠ-সংকেত ঃ ভারতের কৃষকের চোখ দিয়া দেখা এই কবিতায় ভারতবর্ষের একটি অজেয় রূপ প্রকাশ পাইয়াছে। কত দিগ্বিজয়ীর আক্রমণ, কত যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিয়া গিয়াছে ইহার মাটিতে, তবু এ দেশ তাহার যুগযুগান্তের ঐতিহ্য লইয়া জীবন্ত হইয়া বর্তমান বংশধারার মধ্যে অক্ষতভাবে টিঁকিয়া আছে। বর্তমান বংশধারা আজ মুক্তির স্বপ্ন দেখিতেছে।

[ক] **মৌখিক প্রশ্ন ঃ**

১। কবিতার রচয়িতার নাম কি ? তাঁহার সম্পর্কে কি জান ?

২। কবিতাটি আবৃত্তি কর।

[খ] **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

১। এখানে আমার···পূর্বপুরুষেরা।' কোন্ প্রসঙ্গে কবির এই উক্তি ? পূর্ব-পুরুষেরা কিভাবে রক্তের মধ্যে বাঁচিয়া আছে, বুঝাইয়া দাও।

২। 'এখানে রক্তের দাগ···উচ্চৈঃশ্রবাদের খুর।' —চেঙ্গিস, তৈমুর কে ? তাহাদের 'রক্তের দাগ' মানে কি ? তাদের চিহ্ন মুছে দিল আবার কাহারা ? উচ্চৈঃশ্রবা কে ?

[গ] **রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

১। যে সব ঘটনার পরও 'অজেয় এই শতাব্দী গ্রথিত হিন্দুস্থান'—কবির অনুসরণে তাহার বিবরণ দাও।

[ঘ]—**ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ**

১। 'তবুও অজেয় এই শতাব্দী গ্রথিত হিন্দুস্থান।' প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর।

২। 'আজন্ম দেখেছি আমি অদ্ভুত নতুন এক চোখে।' প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা কর।

[ঙ] **ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ**

১। শব্দার্থ লেখ ঃ ঐতিহ্য, বিকশিত।

২। টীকা লেখ ঃ চেঙ্গিস, তৈমুর, উচ্চৈঃশ্রবা।

৩। গদ্যান্তর কর ঃ

আমার সম্মুখে খেত, এ প্রান্তরে উদয়াস্ত খাটি,
ভালবাসি এ দিগন্ত, স্বপ্নের সবুজ ছোঁয়া মাটি ;
এখানে রক্তের দাগ রেখে গেছে চেঙ্গিস তৈমুর,
সে চিহ্নও মুছে দিল কত উচ্চৈঃশ্রবাদের খুর।

৪। ভুল থাকিলে সংশোধন কর ঃ

জানি এ আমার দেশ অনেক ঐতিহ্য দিয়ে ঘেরা,
এখানে আমার মধ্যে মরে গেছে দিগ্বিজয়ীরা।

লেখক পরিচিতি

গদ্যাংশ

১। শিবনাথ (ভট্টাচার্য) শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯)

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারক এবং বিশিষ্ট মনীষী হিসাবে ইনি সমধিক পরিচিত হইলেও, বাংলা সাহিত্যে ই'হার অবদান অনস্বীকার্য। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' ও তাঁহার 'আত্মজীবনী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'যুগান্তর' উপন্যাস ছাড়াও তিনি বহু কবিতা বাঙালিপাঠক সমাজকে উপহার দিয়া গিয়াছেন।

২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)

জন্ম ২৪ পরগনার কাঁটালপাড়ায়। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হিসাবে ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকরি করিলেও, তিনি বাংলা সাহিত্যে ঔপন্যাসিক সম্রাট হিসাবে এবং 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের রচয়িতা হিসাবে চিরস্মরণীয়। তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস 'আনন্দমঠ', 'রাজসিংহ', 'কপালকুণ্ডলা' প্রভৃতি।

৩। গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২)

বাংলাদেশের সর্বাধিক যশস্বী নট ও নাট্যকার। তাঁহার অভিনয় গুণে এবং নাটক রচনায় সেকালের বাঙালী সমাজ মন্ত্রমুগ্ধ ছিল। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিষয়ে তিনি বহু নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। সামাজিক বা গার্হস্থ্য নাটক 'প্রফুল্ল' এবং ঐতিহাসিক নাটক 'সিরাজদ্দৌলা' বিশেষ প্রসিদ্ধ।

৪। বিবেকানন্দ (১৮৬২-১৯০২)

রামকৃষ্ণদেবের প্রভাবে তাঁহার অধ্যাত্মজীবনের বিকাশ ঘটে কিন্তু তাঁহার কর্মজীবন কেবল অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসায় বদ্ধ ছিল না। জাগ্রত জাতীয়তাবোধে, সমাজ-সেবায় চিত্ত তাঁহার উৎকণ্ঠিত থাকিত। সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহার উন্নত চিন্তা ও অজস্র প্রবন্ধ সমধিক গর্বের বস্তু।

৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র। সাহিত্যজগতে বিশ্বকবি রূপে তিনি পরিচিত। কবি-খ্যাতি তাঁহার প্রধান হইলেও তাঁহার গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সঙ্গীত, চিত্র—বাংলার কলাজগতকে উন্নত এক শীর্ষে স্থাপিত করিয়া দিয়াছে। ১৯১৩ সালে তিনি বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে 'নোবেল' পুরস্কারে সম্মানিত হন।

৬। দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৮৮-১৯৩৯)

ঢাকা জেলায় লেখকের জন্ম—ঢাকা এবং কুমিল্লাতে শিক্ষাদীক্ষা সমাপ্ত হয়। কুমিল্লা স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করিতেন। জীবনে তাঁহার প্রধান উম্মাদনা ছিল সাহিত্য

রচনা—বিশেষ করিয়া নষ্টপ্রায় পুরাতন বাংলা সাহিত্যের পুঁথি সংগ্রহ। এই উম্মাদনা হইতে জন্মলাভ করে বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় ধারণা। পরবর্তীকালে ওই নামেই তাঁহার বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়—যাহা তাঁহার অসামান্য কীর্তিরূপে বাঙালী চিরকাল মনে রাখিবে। নিজ কর্মগুণে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অধ্যক্ষ' নিযুক্ত হন। তাঁহার অন্যান্য রচনার মধ্যে সুবিখ্যাত 'রামায়ণী কথা' ও 'বৃহৎ বঙ্গ।'।

৭। সখারাম গণেশ দেউস্কর (১৮৬৯-১৯১২)

পিতৃকুল মহারাষ্ট্রের—কিন্তু তাঁহাদের জীবন-প্রবাহের বৈচিত্র্যে ভারতের পশ্চিম হইতে একেবারে পূর্বে আসিয়া পড়েন। বস্তুত সখারামের জন্ম ও কর্মভূমি বাংলাদেশ হইয়া দাঁড়ায়। ছাত্রজীবনে দেওঘর স্কুলের প্রধান শিক্ষক খ্যাতনামা যোগীন্দ্রনাথ বসুর প্রভাবে আসিয়া পড়েন। এই সময়ে রাজনারায়ণ বসুর সহিতও তাঁহার যোগাযোগ ঘটে। কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর তিতি সাংবাদিক জীবন গ্রহণ করেন—সুখ্যাত 'হিতবাদী' পত্রিকাও তিনি সম্পাদন করেন। এই পত্রিকায় দেশাত্মবোধক নানা রচনা তাঁহার প্রকাশিত হইত। ১৯১০ সালে তাঁহার 'দেশের কথা' ইংরেজ সরকার বর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। এক কালে তাঁহার রচনা দেশভক্ত ও তরুণ সমাজকে বিশেষভাবে আন্দোলিত করিয়াছিল।

৮। ডঃ প্রমোদ সেনগুপ্ত

লেখক বর্তমানে পরলোকে। স্বভাবধর্মে ছিলেন বিপ্লবী। ইংরাজ সরকারের বন্ধনী এড়াইয়া ইনি দীর্ঘকাল জার্মানীতে ছিলেন। স্বদেশী ভাবনায় উদ্বুদ্ধ তিনি নানা ঐতিহাসিক রচনা রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে সিপাহীবিদ্রোহের উপর রচিত গ্রন্থখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

৯। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)

অদ্বিতীয় কথাশিল্পী রূপে তিনি পরিচিত। কিছু গল্প ও আলোড়ন করা কিছু উপন্যাস রচনায় বাংলা সাহিত্যকে তিনি বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 'শ্রীকান্ত' তাঁহার প্রসিদ্ধ উপন্যাস—'মহেশ' তাঁহার বিখ্যাত ছোটগল্প। অন্যান্য রচনা—গৃহদাহ, নিস্কৃতি, দত্তা, পণ্ডিতমশায় প্রভৃতি।

১০। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (জন্ম ১২৭১ সাল, ৫ই ভাদ্র)

বাংলায় বিজ্ঞানভিত্তিক রচনায় ইনি প্রথম সারির লেখক। জন্ম মুর্শিদাবাদে। নিজে ছিলেন বিজ্ঞান শাখার একজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত—বর্তমান 'সুরেন্দ্রনাথ কলেজে' অধ্যক্ষতা করতেন। উন্নত এক বিজ্ঞান মনস্কতা লইয়া তিনি আজীবন ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও অবদান সম্পর্কে নানা বিষয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—'প্রকৃতি', বিজ্ঞান', 'চারুকলা।'

১১। সতীশচন্দ্র মিত্র

একজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক হিসাবে সতীশচন্দ্র প্রসিদ্ধ। তাঁহার বিখ্যাত রচনা 'যশোহর খুলনার ইতিহাস'—যে গ্রন্থ হইতে বর্তমান অংশ উৎকলিত হইয়াছে। শুধু ঐতিহাসিকতা নয়, তাঁহার রচনায় একটা প্রবল দেশপ্রীতি লক্ষ্য করা যায়।

১২। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯০২)

ভারতের বহু দুর্গমস্থানে লেখক ভ্রমণ করিয়াছেন। সেই সব অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীর সৃষ্টি। রচনায় লক্ষণীয়—শুধু কথা নহে, বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের বিশিষ্ট মানুষগুলির সহৃদয় পরিচয়।

১৩। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৪-১৯৫৬)

বর্তমানে বাংলাসাহিত্যে অতি আধুনিক ধারার যে সূত্রপাত দেখা যায়—তাহার এক শক্তিশালী লেখক মানিকবাবু। শরৎচন্দ্রের মতই অভিজ্ঞতা তাঁহার বহুমুখী ও বিচিত্র। সমাজের তথাকথিত নীচু-তলা সম্পর্কে যেমন তাঁহার অকৃত্রিম দরদ, তেমনি তাহাদের স্বপক্ষে একটা কঠিন প্রতিবাদ তাঁহার রচনাকে বিশিষ্টতা দিয়াছে। বর্তমানে ইনি গতায়ু।

১৪। নীহাররঞ্জন রায়

লেখক একজন যশস্বী ঐতিহাসিক ও অধ্যাপক। তাঁহার রচিত 'বাঙালীর ইতিহাস' এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। আজীবন তিনি এই ইতিহাস চর্চাতেই অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন।

১৫। সংকলক সুশীল জানা (১৯১৬)

বৃত্তি অধ্যাপনা। বাংলা সাহিত্যে কল্লোল যুগের রোমান্টিক বোহেমিয়ান ধারার বিরুদ্ধে তিরিশ-চল্লিশের দশকে যে বাস্তবমুখী প্রগতিশীল ধারার সূত্রপাত ঘটে—লেখক সেই ধারার একজন অগ্রগণ্য কথাকার। তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, 'বেলাভূমির গান', 'সূর্যগ্রাস', 'নগরে প্রান্তরে', 'শতদ্রুর সন্ধ্যা।' তাঁহার সাহিত্য-কীর্তির জন্য তিনি বঙ্কিম স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত হন।

পদ্যাংশ

১৬। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

কবি মুকুন্দরাম আনুমানিক ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে বর্ধমানের দামুন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুকাল সঠিক জানা যায় নাই। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি তিনি। জীবনে বহু দুঃখ তিনি ভোগ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' বাংলা সাহিত্যে উজ্জ্বল এক রত্ন। 'কবিত্ব' গুণে তিনি 'কবিকঙ্কন' উপাধিতে ভূষিত হন।

১৭। ভারতচন্দ্র (১৭১২-১৭৬০)

কবি ভারতচন্দ্রকে বাংলা মঙ্গলকাব্য ধারার শেষ কবি বলা হয়। ১৮শ শতকের শ্রেষ্ঠ কবি তিনি। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের তিনি সভাকবি ছিলেন। 'অন্নদা মঙ্গল' তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য। এইজন্য তিনি 'রায়গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত হন।

১৮। মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

পাশ্চাত্যের ভাবাদর্শের সহিত প্রাচ্যের ভাবাদর্শের মিলন ঘটিয়া বাংলা সাহিত্যে যে আধুনিকতার সৃষ্টি হয়—তাহার প্রথম শ্রেষ্ঠ কবি মধুসূদন। তিনি পাশ্চাত্যের এক ছন্দরীতি বাংলায় প্রবর্তন করেন যাহার নাম 'অমিত্রাক্ষর।' তাঁহার বিখ্যাত কাব্য— 'মেঘনাদ বধ।' তাঁহার এই কাব্য তাঁহাকে চিরকাল বাংলা সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে। কয়টি নাটক ও দুখানি প্রহসনও তাঁহার কীর্তিকে অম্লান রাখিবে।

১৯। বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫ জন্ম)

কবির জন্ম কলিকাতাতেই। পূর্ববর্তী কবিগণ যে মহাকাব্যের ধারা রাখিয়া গিয়াছেন—কবি তাহা অনুসরণ না করিয়া নূতন এক ধারার সূত্রপাত করেন—যাহাকে পাশ্চাত্যের রোমান্টিক গীতিময় ধারা বা Lyrical ধারা বলা যায়। একান্ত আপন অন্তরের অনুভূতি ও মাধুরী মিশাইয়া জগৎ ও জীবনকে দেখার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বিহারীলালকে বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট আসন দান করিয়াছে। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে 'ভোরের পাখী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কারণ পরবর্তীকালে এই রোমান্টিক লিরিক্যাল ধারাই অনুসৃত হইতে থাকে। আখ্যানগত মহাকাব্যের ধারা শেষ হইয়া যায়। 'সারদা মঙ্গল' ও 'সাধের আসন' কবির স্মরণীয় গ্রন্থ।

২০। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)

প্রধানত স্বদেশপ্রেমিক কবি ও নাট্যকার হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলাসাহিত্যে পরিচিত। তাঁহার দেশ-প্রেমমূলক গানগুলি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুক্তি-যোদ্ধাদের বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। তেমনি তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলিও। হাস্যরসের কবিতা রচনাতেও কবি খুবই পারদর্শী ছিলেন। 'সাজাহান', 'দুর্গাদাস' তাঁহার উল্লেখযোগ্য নাটক।

২১। রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০)

সঙ্গীত ও সুর সৃষ্টিতে কবির প্রতিভা চিহ্নিত হইয়া আছে। সেকালের স্বদেশী আন্দোলনে কবির গান বাঙালীর মুখে মুখে ফিরিত। 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়'—আজও স্মরণীয়। তাঁহার পেশা ওকালতী হইলেও কবির জীবন-সাধনা সাহিত্যে ও সঙ্গীতে। কবির স্মরণীয় কাব্যসংগ্রহ 'বাণী' ও 'কল্যাণী।'

২২। গিরীন্দ্রমোহিনী দেবী (১৮৫৮-১৯২৪)

মহিলা কবিদের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্যা। সেকালের অন্তঃপুরচারিণী হইয়াও তাঁহার সাহিত্য ও শিল্প প্রতিভা অবদমিত হয় নাই। 'জাহ্নবী' নামে এক মাসিক পত্রিকাও সম্পাদন করিয়াছেন। চিত্রশিল্পী হিসাবেও তিনি সম্মানিত হইয়াছিলেন। মর্মগ্রাহী-হৃদয়গ্রাহী কবিতা রচনায় তিনি তাঁহার প্রতিভার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'অশ্রুকণা', 'অর্ঘ্য', 'সিন্ধুগাথা'।

২৩। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)

রবীন্দ্রানুসারী কবিগণের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ অগ্রগণ্য। তাঁহার কবিতায় ছন্দ-বৈচিত্র্যের নৈপুণ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়—যে কারণে তিনি বাংলা কবিতায় 'ছন্দের যাদুকর আখ্যা পাইয়াছিলেন। তাঁহার 'কাব্য সঞ্চয়ন' ব্যতীত 'কুহু ও কেকা', 'অভ্রআবির', 'ফুলের ফসল' প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ।

২৪। কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮৩-১৯৭০)

কবির জীবিকা শিক্ষকতা ছিল। সাহিত্য রচনার প্রতি তাঁহার আবাল্য অনুরাগ। আর একটি লক্ষণীয় প্রগাঢ় অনুরাগ তাঁহার জন্মভূমির প্রতি। বর্ধমান জেলার অজয়তীরে কোগ্রামে তাঁহার জন্ম। ওই অঞ্চলের প্রকৃতি, মানুষ, তাহার বৈষ্ণবাচার নানাভাবে তাঁহার কবিতায় প্রতিফলিত। গ্রাম কেন্দ্রিক এই কাব্য রচনার জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যে 'পল্লীকবি' হিসাবে খ্যাত। তাঁহার প্রসিদ্ধ কাব্য গ্রন্থ অজয়, বনতুলসী, বনমল্লিকা, শতদল।

২৫। কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫)

কবি মধ্যযুগের বিখ্যাত বৈষ্ণব-কবি লোচন দাসের বংশধর। ছাত্রপ্রেমিক প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ হিসাবে তিনি আধুনিক অনেক কবি-সাহিত্যিকের গুরু। কেবল প্রখ্যাত কবিই নন—বিজ্ঞ সমালোচক হিসাবেও তিনি সুখ্যাত। তাঁহার কবিতায় বংশগত বৈষ্ণবীয় ধারাটি লক্ষণীয়। কবিত্বগুণে তিনি 'কবিশেখর' উপাধিতে ভূষিত হন।

২৬। নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

বিদ্রোহী কবিরূপে তিনি বাংলা কাব্যজগতে সমধিক প্রসিদ্ধ। রবীন্দ্রপরবর্তী একঘেয়ে রোমাণ্টিক কমনীয়তার মধ্যে তাঁহার কবিতা যেন রুদ্রবীণার ঝংকাররূপে বাজিয়া উঠে। নানা সংকীর্ণতা, মূঢ়তা, কুসংস্কার ও জাতিগত শ্রেণীগত অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁহার দীপ্ত সুর ও কণ্ঠ তাঁহাকে বাংলা সাহিত্যে একটি গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

২৭ জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)

বাংলা কবিতায় রবীন্দ্র যুগের পরিশেষে যে নূতন এক আধুনিক ধারার সূত্রপাত হয়—জীবনানন্দ সে-ধারার একজন শ্রেষ্ঠ কবি। গভীর সৌন্দর্যানুভূতি, মর্মগ্রাহী-

চিত্রকল্প, অপূর্ব শব্দচয়ন এবং আধুনিক গদ্য কবিতার অনবদ্য রূপ-রচনায় তাঁহার তুলনা কেবল তিনিই। তাঁহার কবিতায় বাংলা দেশের রূপ নানা ভাবে নানা ছত্রে জীবন্ত হইয়া আছে। সেক্ষেত্রে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগও লক্ষণীয়।

২৮। কাজী কাদের নওয়াজ

সংযুক্ত বাংলার একজন স্বনামখ্যাত কবি। কবিতা রচনায় তাঁহার সাবলীল ভঙ্গী, সহজ প্রকাশ ও কৌতুকের মিশ্রণ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট।

২৯। প্রেমেন্দ্র মিত্র (জন্ম ১৯০৪)

বর্তমানকালের অগ্রগণ্য কবি প্রেমেন্দ্র। সাগর থেকে ফেরা' কাব্যগ্রন্থের জন্য ইনি রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত হইয়াছেন। আধুনিক যন্ত্রযুগ ও তাহার নানা শোষণ, তাহারই মধ্যে অপরাজেয় মানুষের অনবদমিত অভিযাত্রা—তাঁহার কবিতায় প্রথম ঝংকৃত হইয়া উঠে। ছোটদের জন্য তাঁহার 'ঘনাদা' সিরিজ বিশেষ প্রসিদ্ধ। 'প্রথমা' তাঁহার আর এক বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ।

৩০। সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭)

কবির জীবন বড় স্বল্পায়ু—মাত্র ২১ বছর। কাব্যজীবন আরও অল্পপরিসর কিন্তু তাহারই মধ্যে তাঁহার বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর বাংলা কাব্যজগতে উজ্জ্বল হইয়া আছে। কবি জীবনবিশ্বাসে সাম্যবাদী। ভারতের স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে যে অশান্ত চঞ্চলতা সারা দেশে পরিব্যাপ্ত ছিল—সেই চঞ্চলতা মিশ্রিত আশা ও উদ্দীপনা কবির অতি তরুণ কাব্যজগতকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার বিখ্যাত কাব্যসংকলন গ্রন্থ 'সুকান্ত রচনা সমগ্র।'